পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারী – জুন, ২০১৮

সংকটে শৈশব শিক্ষা ও বাংলাভাষা
শিক্ষার সংহার
কুসংস্কার বিরোধিতার চরিত্র
দিল্লির ধোঁয়াশা
বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপনে কলকাতা
সৌর সেচ সমবায়
অনলাইন সংবাদ পোর্টালের নিয়ন্ত্রণ
হিমাচল মেষপালকদের ভেড়া চুরি হচ্ছে

বি ও বি এ-শতকে

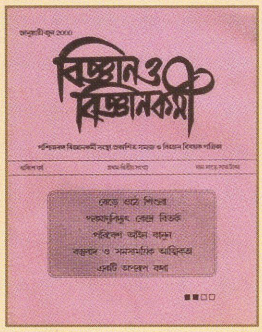

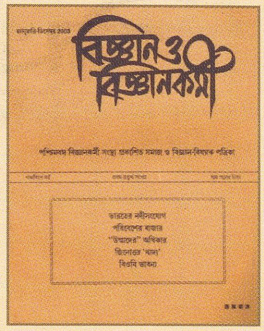

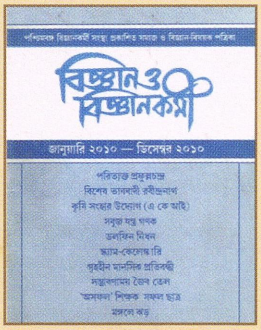

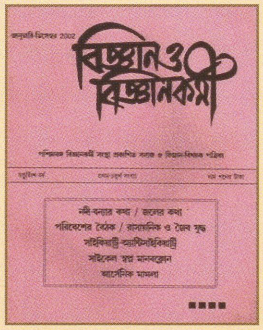

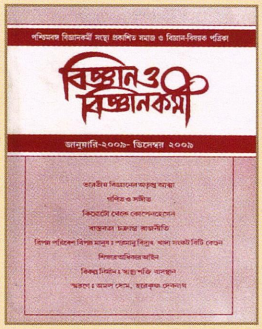

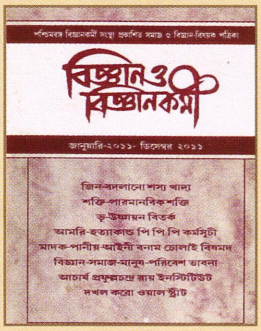

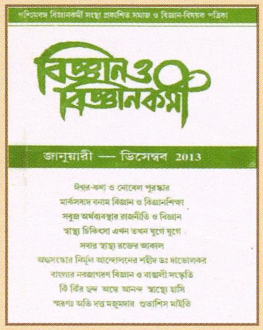

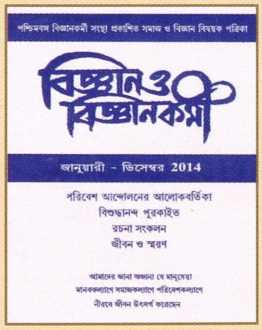

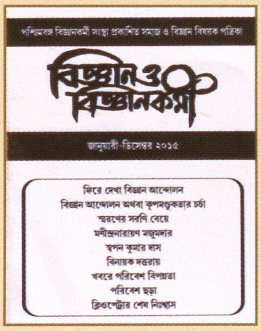

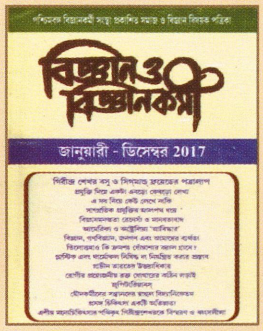

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পড়ুন ও পড়ান

পুরোনো বি ও বি

সংগ্রহ করুন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 41 সংখ্যা 1-2
জানুয়ারী—জুন 2018
Vigyan O Vigyankarmi
Reg No. 3429/79
Vol. XLI No. 1-2
January 2018 - June 2018

সূ চী প ত্র

আমাদের কথা — সম্পাদক মণ্ডলী
বিপর্যস্ত শৈশব বিপন্ন শিক্ষা ও বাংলাভাষা
—রবীন মজুমদার.....পৃ. 02
শিক্ষা সংহার—১৯৭০ থেকে ২০১৮
—শুভাশিস মুখোপাধ্যায়..... পৃ. 15
'কুসংস্কার' বিরোধিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করা :
কোলকাতা ১৯৮৪ এবং নিউ ইয়র্ক ২০১৬
—সুদীপ্ত সরস্বতী.....পৃ. 25
প্রিয় সংশয়বাদী, আপনারা কম আক্রমণ করুন
হোমিওপ্যাথিকে অথবা ইয়েতিকে, বরং
তুলোধনা করুন ম্যামোগ্রাম আর যুদ্ধকে
—জন হরগ্যান
(অনুঃ অঞ্জন মজুমদার).....পৃ. 33
ধোঁয়াশায় শীতের দিল্লি আবার যেন গ্যাস চেম্বার
—অপর্ণা চক্রবর্ত্তী.....পৃ. 39
পরিক্রমা..... পৃ. 46
রিপোর্ট..... পৃ. 52
চিঠিপত্র..... পৃ. 55

Contact :
Rabin Majumdar
rabin.majumdar@gmail.com
B27/1 Kalindi Housing Estate
Kolkata-700 089
Website : www.scienceandsocietyinbob.com
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

আমাদের কথা

'আমাদের কথা'য় কওয়ার মত কথা এই সংখ্যার অনুষঙ্গে সে অর্থে আমাদের নেই। আর প্রতি সংখ্যায় 'আমাদের কথা' যে থাকতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ করেনি। গেল সংখ্যায় ছাপানোর জন্য যে লেখাপত্র এসেছিল, স্থানাভাবে তার সব ছাপা যায়নি। যাঁরা ফেরৎ চেয়েছেন, তাঁদের দিয়েও কিছু লেখা হাতে ছিল। এদের সাথে কিছু নতুন লেখা নিয়ে বিওবি'র এই সংখ্যা বেরুচ্ছে।

বিওবি'র উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নতুন করে পাঠকদের জানানোর কিছু নেই। বিওবি বরাবরই বিজ্ঞান-মানুষ-পরিবেশের মাঝের সম্পর্কের গভীরে ঢুকে সংশয়ী চোখে কোন কিছুকে দেখতে চেয়েছে। সেই ধারা বজায় আছে। পুরানো পাঠকতো বটেই, নতুনেরা বইটা হাতে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝবেন কি? সেটাই দেখার। লক্ষ্য ঠিক রেখে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের লেখা রাখার চেষ্টা হয়েছে। যেমন, শিক্ষা, পরিবেশ, কুসংস্কার বিরোধিতার ক্ষেত্র, ইত্যাদি। আরও টুকটাক কিছু লেখাপত্রও থাকছে।

বিওবি থাকবে কি থাকবে না সে বিতর্কটা অনেক দিনের। এই সংখ্যাটা হাতে পেয়ে বিতর্কটা আবার পাঠক মনে যদি জাগে, তাহলে তার জেরে বিওবি'র থাকা-না-থাকার বিতর্কের চাইতে অন্যতরও কিছু ঘটতে পারে। সেটাই দেখার!

মত-প্রকাশে লেখকের স্বাধীনতায় আস্থাশীল বিওবি। লেখা নির্বাচনে বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার প্রসাদগুণই বিবেচনা করা হয়। লেখকের সম্মতি না থাকলে বানান ও যতিচিহ্নে ন্যূনতম সংস্কার ছাড়া আর কোনো রকমে লেখায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। — সম্পাদক মণ্ডলী, 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'

বিপর্যস্ত শৈশব বিপন্ন শিক্ষা ও বাংলা ভাষা

রবীন মজুমদার

E-mail : rabin.majumdar@gmail.com

আলোচনার কেন্দ্রে ৩-৬ বছরের কচিশিশুরা। তাদের যত্ন-আত্তি বিকাশ-শিক্ষা'র কথা। শিক্ষা অধিকার আইন ৬-১৪ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষাকে শিশুর মৌলিক অধিকার গণ্য করলেও, ৩-৬ বছরের কচিশিশুদের তার বাইরে রেখেছিল। এর ফলে হয় এই শিশুরা তাদের বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সেবা ও শিক্ষা থেকে একদমই বঞ্চিত হচ্ছে অথবা দায়সারা গোছের কিছু একটু পাচ্ছে আর নাহয় মাতৃভাষামুক্ত শিক্ষা-বাণিজ্যের দুর্মূল্য উপকরণে পরিণত হচ্ছে। সবটাই এই কচি-শিশুদের অধিকার হরণ। দেশ/রাজ্যের সরকার বা শিক্ষক অবিভাবক—আমরা যারা বড় তাদের সকলের সম্মিলিত এই শিশুর অধিকার-হরণ-প্রমত্ততার বলি শৈশব, শিক্ষা এবং শিশুর মাতৃভাষা। বাংলাভাষা। সরকার এ দায় এড়াতে পারেন না। বিপর্যয় এড়ানোর, উত্তরণের উপায় আছে হাতের নাগালেই, সন্ধান করেছেন লেখক।

—কি গো ডলিদি, শিরিনের জ্বর জারি হয়েছিল নাকি? কতদিন পরে এলে। এখানে এলেই লাডো বলে, শিরিন আসছে না কেন? কোন খেলাতেই মন বসেনা ছেলের।

—আরে না, শিরিন ভালোই আছে। জানোই তো, ও এখন স্মার্ট গার্লসে ভর্তি হয়েছে। সকাল নটায় বাস আসে, সাড়ে তিনটেয় নামিয়ে দিয়ে যায়। একটু খাওয়া দাওয়া করেই মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় তিনদিন টিচার আসে। ওর বাবার তো বাইরে ট্যুর লেগেই আছে। যত দায় আমার। এক এই রবিবার ছাড়া পার্কে আসবার সময়ই তো নেই।

—ও তাই বলো। আমারই চিন্তা হচ্ছিল। আচ্ছা ডলিদি, স্মার্ট গার্লসে ওকে ভর্তি করলে কি করে? ওদের তো অনেক খাঁই শুনেছি, কম্পিটিশিন খুব নাকি। লাডো তো তিনে পড়বে সামনের মাসে। এখন থেকেই আমার রাতে ঘুম হয় না। কোথাও ভর্তি হতে না পারলে কি যে হবে। শিরিনের কত বয়স হল গো?

—এই তো সাড়ে তিন। ওর জন্মটা তো জুলাই মাসে। তাই প্রায় ছমাস দেরী হয়ে গেল। গতবারই অ্যাটেম্পট্ নিয়েছিলাম। কিন্তু এস জি তো তিন প্লাস না হলে নেবে না। অগত্যা! আমি চেয়েছিলাম বার্থ সার্টিফিকেটটা পাল্টে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী করে নিতে। ওর বাবা বলল, অত ছোটাছুটি করতে পারবে না। এবার আমরা চারটে স্কুলে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, দুটোয় নামই উঠল না। বিপিএলে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেখানে তো পেল না, ভালোই হল, ওদের টাকা আরও অনেক বেশী। তোমার তো ভাই সুবিধে। ছেলেদের কত অপশন, বেশীর ভাগই তো ফোর প্লাসে নেয়, মেয়েদের তিন প্লাস...

কয়েক হাত দূরে বসে স্মার্টফোনে ঠোকাঠুকি ঘসাঘসি করছিলেন আর এক মা। তিনি বলে উঠলেন, আরে সেটাই তো ছেলেদের মা-বাবার বিরাট অসুবিধে। আমি তো চাকরিটাই ছেড়ে দিলাম। দস্যু ছেলেকে কার কাছে রেখে যাব? শ্বশুরমশাই আছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তো নিজেই এক রুগি! তিন প্লাসে নিলে আমরা গতবারই জয়কে ডলফিনসে ভর্তি করে দিতে পারতাম।

লাডোর মা—আচ্ছা, তোমরা এসব স্কুলের খোঁজখবর পেলে কি করে? স্কুলে স্কুলে গিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে নাকি?

—ওমা, তাও জানোনা? লাডো কোনো প্লে-স্কুলেও যাচ্ছে না? —শিরিনের মার গলায় উদ্বেগ।

—যাচ্ছে তো, লিট্‌ল্ এঞ্জেলে, এই মাস তিনেক।

—ওরাই তো খোঁজখবর দেয়। কোন স্কুলে কবে থেকে ফরম দেওয়া শুরু হবে, কোন বয়েসে ভর্তি নেয়, কতজনকে নেবে—স-ব। শিরিনের ব্লু বার্ডস তো আমাদেরও ডেকে পরামর্শ দিয়েছিল, পেরেন্টসদের ইন্টারভিউতে ওরা কি ধরণের কি জিজ্ঞেস করতে পারে....

—ওমা, তাও বলে বুঝিয়ে দেয়, খুব ভালো তো। কিন্তু ডলিদি, পেরেন্টস্‌দেরও ইন্টারভিউ দিতে হয় নাকি?

—নিশ্চয়ই, বাচ্চাদের ভর্তি করতে তো কোন টেস্ট নেয় না। এই একটু কথা বলা, কোনটা কি রং, বাবা-মার নাম কি, কি খেতে ভালবাসে। এইসব টুকিটাকি। বুঝে নেওয়া আরকি, বাচ্চাটা কথা-টথা বলতে পারে কিনা, প্রশ্ন ধরতে পারে কিনা, এই। কিন্তু পেরেন্টসদের ইন্টারভিউটা মাস্ট। আসলে ওরা দেখে নিতে চায় তারা বাচ্চার শিক্ষার ব্যাপারে কতটা

কনসার্নড। তারপর হাসতে হাসতে শিরিনের মা যোগ করেন—আর নিশ্চয় মেপে নেয়, টাকাপয়সা দিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে কি না....

—সবই ইংরেজীতে হবে তো, বাচ্চারও, আমাদেরও?—লাডোর মা উদ্বিগ্ন।

উত্তরটা এলো জয়ের মা'র কাছ থেকে—তা, ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি হবে, ইংরেজীতে বলবে না তো কি।

বলতে বলতেই তাঁর নজর গেল অন্যদিকে, চেঁচিয়ে উঠলেন—জয়, নো নো, ডোন্ট ডু দ্যাট। ফ্রেণ্ডকে অগ্রে উঠতে দাও। স্ট্যাণ্ড ইন কিউ, গো ওয়ান বাই ওয়ান।—কে আগে স্লিপে উঠবে তাই নিয়ে জয় আরও দু তিন জনের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করছিল।

লাডোর মা করুণভাবে বলে ওঠেন—লাডোর বাবা বলে এখন থেকে ইংরাজী শেখানোর চাপ দেওয়া কি ভালো হবে? তার চেয়ে বিনি পয়সার সরকারী বাংলা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। খেলাধুলা করে আর দুটো বছর কাটাক না।

—ম্যাগো কি বিচ্ছিরি চিন্তা, বলেন ডলিদি।—আমার শ্বশুর মশাইও বলেছিলেন, ইংরেজী স্কুলের পেছনে কেন দৌড়চ্ছ তোমরা বৌমা। পাঁচবছর বয়েস হলে তখন একটা সরকারী স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ভর্তি করে দিও। বাচ্চার জন্য মাতৃভাষা হলো মায়ের দুধ, জানো তো। ওতেই শিক্ষেটা ভালো হবে। আমিও সোজা বলে দিয়েছি, তোমাদের কাল আর নেই বাবা। এখন ইংরেজী না জানলে পরে কোথাও কঙ্কে পাবে না। সবাই কি বোকা? তারা কেন দৌড়চ্ছে? না বাবা, এখন ওভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকার দিন আর নেই। তিন বছরে অন্য বাচ্চারা কতটা এগিয়ে যাবে ভাবতে পারো?....

এই সংলাপ-ক্লিপিংসগুলোর স্থান-কাল পাত্রের একটু পরিচয় দিই। স্থান ও কাল : কলকাতার এক প্রান্তে একটি আবাসিক পাড়ার বাচ্চাদের খেলার এক চিলতে পার্ক। নামেই পার্ক, একটুও ঘাস নেই। সরঞ্জাম বলতে আছে একটা মেরী-গো-রাউণ্ড, দুটো দোলনা, একটা স্লিপ। সেগুলো এক কোনে গা ঘেঁসাঘেসি করে বসানো। প্রত্যেকটির গায়ে অযত্ন অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। বাচ্চারা দু'চার জন আসে। কখনও কখনও রবিবার বা ছুটির দিন সংখ্যাটা একটু বাড়ে। সেরকমই একটি পার্কে এক রবিবারের সন্ধ্যা।

পাত্র : আসলে পাত্রী। সবাই দু-তিন চার বয়সী বাচ্চার মা। এমনিতে তাঁরা পার্কে এসেই বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেন। সে তার মতো থাকে, খেলে। একপাশে একটা উঁচু সিমেন্টের বেদী মত আছে। সেখানে বসে সাধারণত মায়েরা নিজেদের মোবাইল নিয়েই মেতে থাকেন। কদাচিৎ গল্পগুজবও হয় অন্য মায়েদের সঙ্গে।

হ্যাঁ, আমার এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু ছয় বছরের কম বয়সী শিশুরা। তাদের শিক্ষা, তাদের বেড়ে ওঠা। তাদের নিয়ে আমরা সবাই তো খুবই আগ্রহী, খুবই চিন্তিত, খুবই তৎপর। আর সব কিছুর পেছনে আছে—তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা, একটা ভালো স্কুলে তাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা।

ছ'বছরের কম বয়সের শিশুরা কেন? কারণ, এরাই সেই ভবিষ্যৎ নাগরিক যাদের নিয়ে এদেশে এরাজ্যে নিয়ম-নীতি-ব্যবস্থার বড়ই অভাব। না, কথাটা বোধহয় ভুল বললাম, বড়ই প্রাদুর্ভাব। কেন, কি বেত্তান্ত বলার আগে আমাদের মৌলিক (Elementary) শিশুশিক্ষার হাল-হকিকৎ একটু জেনে নিতেই হবে।

মৌলিক অধিকারের মৌলিক শিক্ষা

গোড়াপত্তনী শিক্ষায় শিশুদের মৌলিক অধিকারের (Fundamental Right) দাবী এদেশে বহু পুরনো। শতাধিক বছরের সেই ইতিহাস পেরিয়ে বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে অবশেষে ২০০৯ সালে প্রণীত হলো কেন্দ্রীয় আইন। পোষাকী নাম—ব্যয়হীন ও বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার অধিকার আইন (Right of Children to Free and Compulsory Education Act), চলতি কথায় যা শিশুদের জন্য 'শিক্ষা অধিকার আইন' নামেই পরিচিত। এবং এটি ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের জন্য। সাধারণের দৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই আইন এ রাজ্যে চালুও হয়ে গেছে। আট বছর অতিক্রান্ত। এখন নানা কথা উঠছে, নানা সমস্যার কথা, নানা সমাধানের কথা। এমনকি আইনটি পাল্টানোর কথা, সংশোধনের কথাও। কিন্তু সেসবের মধ্যে যাচ্ছিনা, কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব মাত্র।

শিশু-শিক্ষার প্রথম ধাপকে ব্যয়মুক্ত শুধু নয়, ভয়মুক্ত ও ভারমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছিলেন অনেকদিন ধরেই, নানা কমিটি-কমিশন। সেই লক্ষ্যে শিক্ষা অধিকার আইন একগুচ্ছ নতুন ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাইল। যেমন, ভর্তির ক্ষেত্রে কোনরকম পরীক্ষা বা নির্বাচন থাকবে না। পাশ-ফেল থাকবে না, তবে শ্রেণী (ও বয়স) ভিত্তিক ঘাটতি বোঝার জন্য থাকবে 'সার্বিক ও নিরবচ্ছিন্ন' মূল্যায়ন, অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনরকম

বেতন বা অনুদান নেওয়া যাবে না, কোনরকম শারীরিক শাস্তি বা মানসিক পীড়ন চলবে না শিশুর উপর; শিক্ষকের ভূমিকা হবে বন্ধুর, সহায়কের। তিনি শিশুকে শিক্ষা পেতে সাহায্য করবেন মাত্র, শিক্ষা দেবেন না, পদ্ধতি হবে ক্রিয়া ভিত্তিক এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। শিক্ষার মাধ্যম হবে, যতদূর সম্ভব, মাতৃভাষা। ৩৫-৪০ জন শিক্ষার্থী পিছু একজন করে ধরে, ন্যূনতম সংখ্যক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত উপযুক্ত শিক্ষক তো থাকবেনই প্রতি স্কুলে, তাছাড়া, পরিকাঠামো এবং শিক্ষা-উপকরণ নিয়েও ছিল সুস্পষ্ট আইনী নির্দেশ— প্রত্যেকটি স্কুলে থাকতে হবে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি যাতে অর্ধেক সংখ্যক থাকবেন নারী। সমিতিতে শিক্ষক, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গেই থাকবেন তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবা-অভিভাবকদের প্রতিনিধি। স্কুলে স্কুলে থাকবে লাইব্রেরী (সেখানে থাকবে বিষয় ভিত্তিক পাঠ্যবই এবং খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র), থাকবে খেলার মাঠ ও খেল-সরঞ্জাম, রান্নাঘর। ১০০'র বেশী শিক্ষার্থী যেসব স্কুলে সেখানে একজন করে আংশিক সময়ের প্রশিক্ষক (Instructor) থাকবেন, শিল্প (অঙ্কন) শিক্ষার, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার এবং কর্মশিক্ষার জন্য। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব কিছু থাকা-না-থাকার-নিরিখে এরাজ্যের শিশুদের গোড়াপত্তনী শিক্ষার স্কুলগুলির হাল-হদিসের খোঁজ নিতে গেলে দেখা যাবে সে এক বিশাল নেই-রাজ্যের নৈরাজ্যের দেশ। একটা কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষা অধিকার আইন অনুসারী নতুন পাঠ্যপুস্তক তৈরীতে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যবই রচনা এ রাজ্যে বেশ তাড়াতাড়িই সম্পন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুন আঙ্গিকের সেইসব পাঠ্যবই যথেষ্ঠ ভালো হয়েছে বলতেও আমার দ্বিধা নেই। বিশেষত যদি মাথায় রাখা যায় যে মুখস্থ-নির্ভর পুরনো পাঠদান পদ্ধতির বিপরীতে শিশুদের পাঠ-গ্রহণের উপযোগী বই তৈরীর এটি প্রথম প্রচেষ্টা। সংশ্লিষ্ট সকলের—বিশেষত শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্মিলিত অবদানে ক্রমে সেগুলি আরো ভালো হতেই পারে। কিন্তু শুধু বই দিয়ে তো নতুন ধরণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষা সঠিক পথে এগোতে পারে না। বইগুলি যারা ব্যবহার করবেন, শিশুদের কাছে উপস্থাপন করবেন, সেই শিক্ষকরা যদি নতুনত্বের দিকগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হন, তবে তাঁদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে বা অভিভাবকদের কাছেও তা পৌঁছতে পারে না। আর সেখানেই আছে পাহাড়প্রমাণ সমস্যা। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাকর্মী নেই, শিক্ষক নেই, নিয়োগের পথে হাজারো সমস্যা এবং বাধা-সেসব তো রাজ্যবাসীর অজানা নয়। কিন্তু যেটা হয়তো অনেকেই জানেন না যে সার্বিকভাবে শিক্ষকসংখ্যায় বড়ো ঘাটতি থাকলেও, কোথাও কোন স্কুলে হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় বেশী শিক্ষকই আছেন, তবু হয়তো সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষক বা ইতিহাসের শিক্ষক একজনও নেই। প্রতীচী ট্রাস্টের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মত পিছিয়ে থাকা জেলাগুলিতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-ঘাটতি সবচেয়ে প্রকট। নতুন ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে উত্তরণ ঘটানোর জন্য শিক্ষকদের তালিম দেওয়ার ক্ষেত্রেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত। এখনও পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষকই এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা পেয়েছেন তাও বহুক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। এরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অর্ধেকেরও বেশী স্কুলেই প্রায় আইন-মাফিক পরিচালন সমিতি নেই। খেলার মাঠ, পানীয় জল, ছেলে ও মেয়েদের আলাদা টয়লেট—এসব বিচার করতে গেলে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। লাইব্রেরী, কম্প্যুটার বা অ্যাক্টিভিটি রুম ইত্যাদির কথা তো যত কম তোলা যায় ততই ভালো। তাছাড়া, অর্ধেকের বেশী স্কুলেই তো শিক্ষার্থী-সংখ্যা ১০০'রও কম; আইন মোতাবেকই, এসব স্কুলে তো অঙ্কন শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা বা কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও চলে!

এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব-জটিলতা ও অব্যবস্থা। এ রাজ্যে শুধু নয়, ভারতের সব রাজ্যেই নতুন আইন কার্যকর হবার আগে স্কুলশিক্ষা বিভক্ত ছিল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে। ছিল তাদের পরিচালন নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক পৃথক বোর্ড বা কাউন্সিল। নতুন আইনে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এক লপ্তের এক পর্যায়ের শিক্ষা, যাকে বলা হচ্ছে মৌলিক বা এলিমেন্টারী শিক্ষা এবং এই শিক্ষাতেই শিশুর সংবিধান ও আইন প্রদত্ত মৌলিক তথা ফাণ্ডামেন্টাল অধিকার। অথচ এর জন্য নেই কোন পৃথক মন্ত্রক, দপ্তর বা বোর্ড বা কাউন্সিল। পুরনোদেরই কর্তৃত্ব চলছে, আবার চলছেও না, কারণ এক্তিয়ার অস্পষ্ট।

এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ বা তার প্রশাসনিক কেন্দ্র 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন' যেমন। এঁদের একটি ওয়েবসাইট আছে, সেটি খুললে আপনি পাবেন বহু পুরনো কিছু লক্ষ্য-নীতি নির্দেশিকা; হালের কোন তথ্য বা বিজ্ঞপ্তির হদিস নেই সেখানে। বহুকাল আপডেট করা হয়নি বোঝা যায়, মৃতই বলা যায় ওয়েবসাইটিকে।

কিন্তু এই সবকিছু ছাপিয়ে দুটি প্রশ্নে উত্তাল জনমানস এবং মিডিয়া, অবশ্যই।

এক, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল না থাকা। চারদিকে 'গেল গেল' রব। মধ্যবিত্ত অভিভাবক এবং শিক্ষকদের এক বড়ো অংশ তো বটেই সরকারও তাতে সহমত। কেন্দ্রীয় সরকারে এখন যাঁরা আছেন, ২০০৯-এ আইন প্রনয়ণের সময় তাঁরাও এতে সায় দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা ভুল হয়েছিল। এ রাজ্যের সরকারও এ ব্যাপারে বিরোধী বা উদাসীন নন। তাঁরাও পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার অনুকূলেই বিবেচনা করছেন।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন—রাজ্য চাইলে, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা ও পাশ ফেল চালু করতে পারেন।

আর দুই, শিশুর শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম। আইন মোতাবেকই এ রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুরা—যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা সরকারী বা সরকার-অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ভর্তি হয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে বাংলা ভাষায় লেখা বইপত্রের সাহায্যে বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা পায়। কিন্তু ইদানীং ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের রমরমা বেড়ে চলেছে। কলকাতা বা শহরতলী, জেলা বা মহকুমা শহর ছাড়িয়ে ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের চাহিদা গ্রামাঞ্চলেও মালুম হচ্ছে। শহরের অনেক স্কুলেই শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যাছে। কোথাও বা স্কুল উঠেই যাচ্ছে বা ধুঁকছে। দেখে শুনে সরকারও নড়ে চড়ে বসছেন। সম্প্রতি এ রাজ্যের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন যে সমস্ত সরকারী স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকেই বাংলা-মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজী মাধ্যমেও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি জেলার ৪২টি স্কুলে তা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়ে গেছে বলে সংবাদে প্রকাশ*। তবে জানা যায়নি কোন চিকিৎসক কিভাবে বাংলা মাধ্যম স্কুলের রুগ্নতা-মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করলেন এবং স্কুলগুলিকে বাঁচাবার এই দাওয়াই বাতলালেন।

ছয় বছরের কম বয়সী কচিকাঁচারা

বলছিলাম ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষার কথা। শিক্ষা অধিকার আইন যাদের কথা বলেছে। এই আইনে কি ০—৬ বছর বয়সী কচিকাঁচাদের জন্য কোন সংস্থান আছে? এই কচিশিশুরাই তো মৌলিক অধিকারের মৌলিক শিক্ষার স্কুলের কাঁচামাল বা খদ্দের। এদের জন্য রাষ্ট্র কি শিক্ষার কোন নিদান দিয়েছে, যদি দিয়ে থাকে তবে সে কি শিক্ষা, কেমন শিক্ষা, কেমন করে কেমন প্রতিষ্ঠানে? কাদের তত্তাবধানে? আর শুধু শিক্ষাই বা কেন, এই কচিকাঁচাদের বৃদ্ধি বিকাশ, স্বাস্থ্য পুষ্টি যত্ন আদর নিরাপত্তা-এ সবই তো সমান বা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সে সব দায়িত্ব কি শিশুর পরিবারেরই? রাষ্ট্রীয় নীতি কি সেরকমই? এ সব প্রশ্ন যতই স্বাভাবিক, উত্তরগুলো ততই অস্বাভাবিক বা বেয়াড়া।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ছিল ০—১৪ বছর বয়সী সব শিশুদের শিক্ষার অধিকারের কথা। শিক্ষার জন্য বয়সের কোন নিম্নসীমার কথা ছিল না। এটা যে বাস্তবসম্মত ছিল না তা বোঝা যাচ্ছিল, নানাসূত্রে। অবশেষে ২০০১ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনীতে অনুচ্ছেদ ২১-এ নতুন রূপে ঘোষিত হল, ৬—১৪ বছর বয়সী শিশুদের আট বছরের মৌলিক শিক্ষায় মৌলিক অধিকার। শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ তাকেই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছে।

ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রসঙ্গ কি তাহলে সংবিধান থেকে বাদ হয়ে গেল? না, তা নয়, **সংশোধিত সংবিধানের ৪৫ নং অনুচ্ছেদে তাদের সম্পর্কে সদিচ্ছা থাকলঃ ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের যত্ন-আত্তি দেখভাল ও শিক্ষার (Early Childhood Care and Education, ECCE) ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে রাজ্যগুলি। এই কথারই প্রতিধ্বনি ঘটল শিক্ষা অধিকার আইনের ১১ নং অনুচ্ছেদে,** তবে তা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বাদ দিয়ে। এতে বলা হল—তিন বছরের উর্দ্ধের শিশুদের মৌলিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে এবং ছয় বছর বয়স পূর্ণ করা পর্যন্ত তাদের সকলের শৈশব পরিচর্যা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে (may make neceassary arrangements) উপযুক্ত সরকার (appropriate Government) যাতে এই শিশুরা ব্যয়হীন প্রাক্-স্কুল শিক্ষা পায় (for providing free pre-school education) । ... তাহলে কি দাঁড়াল? ৩-৬ বছর বয়সের শিশুদের প্রাক্ স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে (অর্থাৎ নাও পারে) 'উপযুক্ত সরকার'। কোন সরকার 'উপযুক্ত'? কেন্দ্র না রাজ্য? শিক্ষা যেহেতু যুগ্ম তালিকাভুক্ত, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়, এবং কেন্দ্র কোন দায়িত্ব নিচ্ছে না তাই এটাকে কৌশলে রাজ্য সরকারের ঘাড়েই ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলা যায়। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষমতা সীমিত, চরম অভাব রাজনৈতিক সদিচ্ছারও। কাজেই ...। কিন্তু না, একটি ব্যতিক্রম আছে। একমাত্র কেরল রাজ্য

* আরও পরের সংবাদ : রাজ্য জুড়ে ১০০টি ইংরেজী মাধ্যম স্কুল গড়ে তুলবে রাজ্য সরকার (আনন্দবাজার : ২৪/০৬/২০১৮)

শিক্ষা অধিকার আইন বাস্তবায়িত করার জন্য যে বিধি (Rules) তৈরী করে তাতে ECCE'র দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার কথা ঘোষণা করে।

তাহলে, তিন বছর বয়স পর্যন্ত কচি-শিশুদের কোন 'শিক্ষা'র ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। এমনটাই সরকারী অবস্থান। পরিভাষায় এদের বলা হয় ইনফ্যান্ট-টডলার (Infant-Toddler), মা-বাবা নিকট পরিজনের সান্নিধ্য, বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত শিশু রক্ষণাগারই (Creche) তাদের পক্ষে ভাল। এটাই স্বীকৃত, শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা বিশ্বজুড়েই বলা যায়। এবং সেটা মানবশিশুর বিকাশ-বিজ্ঞানসম্মত।

পরোক্ষে, তাই, এটাই দাঁড়ায় যে তিন বছর বয়স পর্যন্ত কচিশিশুদের জন্য শৈশব-পরিচর্যাই মুখ্য। কিন্তু তিন থেকে ছয় বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের বেলায় বেড়ে ওঠার একটা আবশ্যিক অঙ্গ 'শিক্ষা'। কালক্রমে এখন সেটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিকাশ ও পরিচর্যাব প্রয়োজনগুলি হয়ে গেছে গৌণ।

অথচ ভারত সরকার বা রাজ্য সরকার কারোরই ঘোষিত অবস্থান এমনটি ছিল না, এখনও নেই। ১৯৭৪-এর জাতীয় শিশুনীতি, ১৯৮৬ ও ১৯৯২-এর জাতীয় শিক্ষানীতি সবেতেই বলা হয়েছিল ছয় বছরের কম বয়সী শিশুরা স্কুল শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে না, তাই প্রথামাফিক ৩-R -এর শিক্ষা* তাদের জন্য নয়। তবে তাদের জন্য, বিশেষত ৩-৬ বছরের শিশুদের জন্য, থাকা উচিত বিকাশমুখী উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা যার মাধ্যমে তারা প্রথামাফিক ৩-R এর শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। বিশদ করে বলা হয়েছিল এদের শিক্ষা হবে খেলাচ্ছলে, শিশুর শারিরীক ও মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী, তাদের জীবনের ও পরিবেশের বাস্তবতার পরিচয় তুলে ধরতে।

১৯৭৫-এ শুরু হওয়া 'সুসংহত শিশুবিকাশ পরিষেবা' (Integrated Child Development Services বা ICDS) প্রকল্পে ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য তেমন প্রয়াসই নেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল না শিক্ষা বা মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রকল্প, নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক গ্রহণ করেছিল এই পরিকল্পনা। এতে শিশুদের স্বাস্থ্য-পুষ্টি, সামাজিক ও আবেগসম্বন্ধিত (emotional) সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ৬টি পরিষেবার একটি ছিল 'শিক্ষা', ক্রিয়াশীলতা-ভিত্তিক খেলাচ্ছলে শিক্ষা, প্রথামাফিক ৩-R এর শিক্ষা বাদ দিয়ে। তৃণমূলে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে আছেন অঙ্গনওয়াদি কর্মীরা। তাদের সামান্য প্রশিক্ষণ, সামান্য ভাতা, এক একজনের অধীনে ৩৫-৪০টি করে শিশু এবং শিশু ও প্রসূতি মায়েদের জন্য রান্না করা, খাবার দেওয়া ইত্যাদি হাজারটা অন্য কাজ। তবু, **এখনও পর্যন্ত, চালু সরকারী ব্যবস্থা হিসেবে** ICDS **ই একমাত্র শিশুদের প্রাক-স্কুল শিক্ষার বড়সড় কর্মসূচী*। ঘোষিতভাবেই এটি নির্দিষ্ট ছিল আর্থসামাজিকভাবে দুর্বল ও গ্রামীন এলাকার জন্য।** পরবর্তীকালের 'কর্মরতা মায়েদের জন্য রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ক্রেশে স্কিম' এবং 'সর্বশিক্ষা অভিযান'-ও প্রত্যক্ষভাবে ততটা না হলেও পরোক্ষভাবে খানিকটা শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায় ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে ৩-৬ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। এই বয়সের সমস্ত শিশুর জন্য ব্যবস্থার কথা ভাবাও হয়নি।

কচিকাঁচাদের প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা ঃ বেসরকারী ব্যবসার বিস্ফোরণ

শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী শিশুরা তাদের সপ্তম বর্ষে স্কুলে ভর্তি হবে। কিন্তু তার আগে ৩-৬ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে আইনে স্পষ্ট কিছু না থাকায় কিছু কিছু মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন যে প্রাক-বিদ্যালয় শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে ইচ্ছে করেই শিক্ষা ব্যবসায়ীদের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে ছেড়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদকও এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল আইনটির পর্যালোচনার সূত্রে। কারণ, তখনই, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বেসরকারী পদসঞ্চার ঘটছিল জোরকদমে। এমনকি, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রও তার বাইরে ছিল না। এরাজ্যে তেমন প্রকট না হয়ে উঠলেও ভারতের অন্য কিছু রাজ্যে তখনই সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রী দারুণভাবে কমতে শুরু করেছিল, স্কুলগুলি কোথাও উঠেই যাচ্ছিল। এবং এমনকি স্কুলের বাড়ীঘর জমি জায়গা বিক্রীও হয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষা অধিকার আইন কার্যকর হবার পরবর্তী ঘটনাবলী কিন্তু সমালোচনা-আশঙ্কাগুলোকে সত্য প্রমাণিত করছে। শিশুদের প্রাক-স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী মাধ্যম বেসরকারী তথাকথিত প্লে-স্কুল এবং বেসরকারী

* Reading, Writing and Arithmetic- অর্থাৎ পড়তে ও লিখতে পারা এবং সরল পাটিগণিতের অঙ্ক শেখা-এটাকেই বলা হয় ৩-R-এর শিক্ষা

* পশ্চিমবঙ্গে চালু অঙ্গনওয়াদি কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ষোল হাজার— ভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। প্রথম উত্তর প্রদেশ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির জুনিয়ার সেকশন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি চালু সরকারী ব্যবস্থাগুলি হয় থমকে থেকেছে, নয়তো সরাসরিই সেসবকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা অধিকার আইন প্রণয়নের পরে এক ব্যবসায়িক সমীক্ষায় ভারতে এই ক্ষেত্রে এক বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসার সম্ভাবনার অনুমান করা হয়েছিল।

তা ব্যবসা সত্যিই বেড়ে চলেছে; এ রাজ্যেও তা প্রভূত বেগবান হয়েছে। এবং তা এতটাই যে সরকারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীতে টান পড়েছে। পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক এক বছরের শিশু শ্রেণীর সংস্থান যদিও আছে অনেকদিন ধরেই, কিন্তু তা ব্যাপকভাবে সব স্কুলে চালু করা হয়নি বা যায়নি; মফস্বল এলাকায় কোন কোন জায়গায় মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরাই উদ্যোগী হয়ে 'শিশু শ্রেণী' চালু করতে সচেষ্ট হয়েছেন প্রবল বাধা বিপত্তি ঠেলে, নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে। আর কলকাতা বা জেলা শহরে সিবিএসই বা আইসিএসই পরিচালিত ইংরেজী মাধ্যম বেসরকারী স্কুলের জুনিয়ার বিভাগে ভর্তির চাহিদা তুঙ্গে, এতটাই যে সরকারী স্কুল, অন্তত শহরাঞ্চলে, অনেকেরই মনে ভয় ঢুকেছে। এমতাবস্থায় এ রাজ্যের সরকার ভেবেছেন, সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইংরেজী মাধ্যমে প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার বন্দোবস্ত করলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

নেই নেই করেও দেশে শিক্ষা, বিশেষত স্কুল শিক্ষা, শিশু শিক্ষা নিয়ে সমীক্ষা গবেষণা করার সরকারী অ-সরকারী আধা সরকারী সংস্থা কম নেই। সেসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং দেশের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা কিন্তু আওয়াজ তুলছেন যে ৩—৬ বছর বয়সী শিশুদেরও শিক্ষা অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের পুষ্টি-স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারই নিক।

সরকারগুলি এ ব্যাপারে অবহিত, কাগজে কলমে এরকমই কিছু করার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেন না, কিন্তু সাড়া মিলছে ধীরে সুস্থে, রয়ে সয়ে, দেখে শুনে। প্রয়োজন মান্যতা পেয়েছে নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ঘোষিত নীতিতে—কচিশিশুদের প্রযত্ন ও শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতি, ২০১৩ (National Early Childhood Care & Education Policy)। কিন্তু তারপর? মন্ত্রী আধিকারিকদের—কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে—আশ্বাস, এই তো ব্যবস্থা হচ্ছে। দেখতে থাকুন! প্রাক-স্কুল ইংরেজী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের রমরমার বিপরীতে সরকারী ব্যবস্থার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে তাঁদের কেউ কেউ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে পরিসংখ্যান আউড়ে বলেন—ওরা আর কত শতাংশ? ব্যবসার নিয়মেই ওরা সীমাবদ্ধ থাকবে শহরাঞ্চলে যারা তাদের মুনাফা দিতে পারবে তাদের মধ্যে। অত চিন্তার কিছু নেই!

পরিসংখ্যান? কচিকাঁচাদের জন্য প্রাক-স্কুল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা তাতে যুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা জানার কি কোন ব্যবস্থা আছে? শিক্ষার্থী বাছাই পদ্ধতি, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ, ডোনেশন বা ফি সংক্রান্ত কিংবা শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কি সরকারের কোন নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ আছে? এইসব কচিকাঁচাদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইনের অন্তর্নিহিত ভাবনা বা দর্শন আরও বেশী করেই প্রযোজ্য। কিন্তু তা কি মানা হচ্ছে? এদের ক্রিয়াকলাপ কি শিক্ষা অধিকার আইন স্বীকৃত সমস্ত নিয়ম-নীতির পরিপন্থী নয়? সব প্রশ্নের উত্তরই তাঁদের জানা এবং সেসব কিছু পরোক্ষ পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়ে বোঝাও যায়। কোন নির্দিষ্ট বছরের নির্দিষ্ট শ্রেণীর পরিসংখ্যান নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বছরের পরিসংখ্যান থেকে গতিমুখ বুঝতে চাইলে কি বোঝা যাচ্ছে না যে অষ্টম শ্রেণীর পর যারা ঝরে পড়ছে তাদের বেশীর ভাগই বাংলা মাধ্যম নির্ভর শিক্ষার্থী আর যারা টিকে থেকে স্কুলের গণ্ডী পার হচ্ছে তাদের মধ্যে ইংরেজী মাধ্যমের পড়ুয়াদের সংখ্যানুপাত ক্রমাগত বেড়ে চলেছে? শিক্ষা-অধিকার আইনের মূল ভাবনা বা দর্শনটা কি তাহলে ভুল ছিল? সাধারণ মানুষ সেরকমই মনে করে বসছেন। কিন্তু সরকার? নীতি যাই থাক, কাজের বেলায় সরকারও কি এই অবস্থান নিচ্ছেন?

কচিশিশুদের শিক্ষা ঃ গবেষণা কী বলে

বিশ্বজুড়ে এই নিয়ে গবেষণা চলে, কারণ অন্য সব দেশেরও এদের নিয়ে নীতি-নিয়ম আছে, আরও আরও গভীরে জানা বোঝার তাগিদ আছে। আমাদের দেশে সরকারীভাবে শিশু-নীতি, শিক্ষা-নীতি এসব নির্ধারণ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি টমিটি হয়। তাঁরা দেশ-বিদেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেই নিয়ম-নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেন। সমালোচনার উর্দ্ধে না হলেও এটাই স্বীকৃত ও যুক্তিসম্মত পদ্ধতি। এইসব পদ্ধতি মেনে আইন জারি হয়, তা রূপায়ণের নীতি-নিয়ম ঘোষিত হয় কিন্তু প্রয়োগের বেলায় দেখা যায় ঢিলেমি, আধখেঁচড়া ব্যবস্থাগ্রহণ, এ আমাদের দেশের এক অদ্ভুত রোগ। শিক্ষা অধিকার আইন

সেই রোগেরই বলি হতে বসেছে। বলছি না, আইন কানুনের সংশোধন সম্প্রসারণ পরিমার্জনের প্রয়োজন নেই। অবশ্যই আছে, কিন্তু সেসবেরও তো একটা পদ্ধতি থাকবে!

যা বলছিলাম, কচিদের 'শিক্ষা' নিয়ে গবেষক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের কথা নির্দিষ্টভাবে ভাবা যেতে পারে। আর এটা নিশ্চয়ই আমরা সবাই যুক্তি দিয়ে বুঝি যে এমন কোন 'শিক্ষা'-র কথা এদের জন্য ভাবা যায় না, যেখানে এইসব কচিশিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের, স্বাস্থ্য-পুষ্টি-নিরাপত্তার বিশেষ প্রয়োজনগুলি কম গুরুত্বের হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরাও সকলেই এ ব্যাপারে একমত। ইদানীংকালে নিউরোসায়েন্সের গবেষণা অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সেসবের প্রয়োগে মানবশিশুর মস্তিষ্কের গবেষণায় ধরা পড়েছে, স্বাভাবিক বিকাশ হতে পারলে বছর দুই বয়সের মধ্যে প্রায় আশি শতাংশ এবং ছবছর বয়সের মধ্যে নব্বই শতাংশ বিকাশ ঘটে মস্তিষ্কের। আর সেজন্য দুনিয়াজুড়ে এখন এই বয়সের শিশুদের মস্তিষ্কসহ সার্বিক বিকাশের সহায়ক বিশেষ শিক্ষারও উদ্ভাবন ঘটছে। এই শিক্ষা বিশেষভাবে এই বয়সের শিশুদের জন্যই—বিষয়বস্তুর দিক থেকেও, পদ্ধতির দিক থেকেও। এবং আর যাই হোক এই শিক্ষা কখনই হবে না প্রথাগত স্কুল শিক্ষার আগাম পত্তন ঘটিয়ে জীবনযুদ্ধে শিশুদেরকে 'এগিয়ে দেবার' প্রচেষ্টা। এরকমটা করা হলে শিশুর বিকাশের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়ে ক্ষতিও ডেকে আনতে পারে। কিরকম ক্ষতি? এই শিশুরা ভীষণভাবেই সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ-নির্ভর। কিন্তু বর্ণ বা সংখ্যার চিহ্নের মত বিমূর্ততার ধারণা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। হয়তো সেগুলি তারা 'শিখেও' নেয়, মুখস্থ করে অনুকরণ করে। সে মুখস্থ আওড়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই স্বাভাবিকতা, মৌলিকতা, উদ্ভাবনশীলতা, সৃষ্টিশীলতা ব্যাহত হয়। অবশ্যই এই শিক্ষা দিতে গিয়ে ডিসিপ্লিনের নামে কিছু অস্বাভাবিক অনুশাসন, শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয় শিশুর উপর। শিশুর মানসিকতায় তার গভীর ছাপ পড়তে পারে। স্বাধীন বিকাশের স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হয়। এমন শিক্ষা একক পরিবারের মধ্যে হয়না, জীবনের খোলা ময়দানে শিশুকে ছেড়ে দিলেও হয়না। আবার প্রথাগত স্কুল শিক্ষা, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের লেজুড় হিসেবে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানেও হবার নয়। পরিকল্পিতভাবে এই শিক্ষার দায়ভার নিতে হয় রাষ্ট্রকেই, তাকেই পালন করতে হয় সহায়ক ও তত্তাবধায়কের ভূমিকা। পরিচালনা সরকারী হোক বা বেসরকারী, কচিশিশুদের শিক্ষার এই পরিসরটা থাকা উচিত—মননে ও চলনে—মুক্ত ও স্বাধীন।

বিপর্যস্ত শৈশব বিপন্ন শিক্ষা

তা বলে কি একেবারে 'বিপর্যস্ত শৈশব' বলার মত কিছু ঘটেছে? একি বাড়াবাড়ি, অতিকথন? আমি কিছু যুক্তি তথ্য হাজির করতে পারি, সিদ্ধান্ত পাঠকের।

২০১১'র জাতীয় জনগণনা তথ্য অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ। তার মধ্যে ৩—৬ বছর বয়সী শিশুদের আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ কোটি।

এই ৬ কোটি ৩—৬ বছর বয়সী শিশুর কতজন রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী একান্ত প্রয়োজনীয় বিকাশমুখী পরিষেবার সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পায় বা গ্রহণ করতে পারে?

২০১০-১১-১২'র কিছু তথ্যের ভিত্তিতে এই ৬ কোটি শিশুর অবস্থান নিয়ে একটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করা যাক।

মোটের উপর বলা যায়, প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৩ কোটি শিশু কোন না কোন শিক্ষাকেন্দ্রে নাম লিখিয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ২ কোটি নাম লিখিয়েছে সরকারী কেন্দ্রে। বাকী ১ কোটি বেসরকারী কেন্দ্রে। সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে আই সি ডি এস (অঙ্গনওয়াদি) কেন্দ্রই সবচেয়ে সংখ্যায় বেশী, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় এই শিশুরা সেখানেই নথিভুক্ত। এদের মধ্যে শহুরে শিশুর অংশ বেশ কমই। আর বেসরকারী ব্যবস্থা প্রধানত থেকেছে শহরকেন্দ্রিক। তাদের স্কুলিং পাচ্ছে যে এক কোটি শিশু তারা প্রায় সবাই শহুরে। তথ্য থেকে আর একটা জিনিষও বোঝা যায়—গ্রামাঞ্চলে কোন কেন্দ্রে/স্কুলে নাম লেখানো তিন বছর বয়সের শিশু খুবই কম, চার বছর বয়সী কিছু বেশী আর সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় পাঁচ বছর বয়সীরা। শহরাঞ্চলে ছবিটা একটু আলাদা—তিন চার বছর বয়সী শিশুরাও সেখানে স্কুলে যাচ্ছে বেশী সংখ্যায়। বোঝাই যায়—এগুলি প্রধানত বেসরকারী ব্যবস্থায়।

পশ্চিমবঙ্গের ৩-৬ বছর বয়সী মোটামুটি ৩০ লক্ষ শিশুর বেলাতেও ছবিটা মোটামুটি একই রকম। শুধু ২০১১-১২ পর্যন্ত বেসরকারী ব্যবস্থায় ৩-৪ বছরবয়সী শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রে যাওয়াটা সর্বভারতীয় তুলনায় বেশ কমই ছিল। ইতিমধ্যে এই প্রবণতা অনেক গতি পেয়েছে। তবুও, ২০১৫-১৬-তেও, এ রাজ্যের ২০ শতাংশ শিশু প্রথম শ্রেণীর আগে কোনোরকম প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে নাম লিখিয়েছে। এখন যা অবস্থা তাতে বলাই যায় শহরে—কলকাতায় তো বটেই, জেলা ও মহকুমা শহরেও—৩-৪ বয়সী শিশুদের (বেসরকারী) ইংরেজী স্কুলে পাঠাবার আগ্রহ যেমন অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র হয়েছে, তেমনি বাজার বুঝে স্কুলও

খুলছে। গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এখনও, পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের স্কুলে পাঠানোর তেমন উদ্দীপনা নেই। সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেরকম কেন্দ্রের অভাবই (অঙ্গনওয়াদি ইত্যাদি যেটুকু ব্যবস্থা আছে তার বাইরে) এর কারণ মনে হয়। শহরে, নানা বাস্তব কারণেই, অভিভাবকরা তিন বছর বা তারও আগেই শিশুকে স্কুলে পাঠাতে চাইছেন। সরকারী ব্যবস্থা একদম না থাকায় তাঁরা ছুটছেন বেসরকারী স্কুলের পিছনে। যেগুলি ব্যতিক্রমহীনভাবেই ইংরেজী মাধ্যম। শহরাঞ্চলে কোন অভিভাবক যদি চান তাঁদের তিন চার বছরের শিশুকে বাংলা মাধ্যম প্লে স্কুলে দেবেন—সরকারী বা বেসরকারী যাই হোক—তাঁকে হতাশই হতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা ইংরেজী মাধ্যম প্লে-স্কুলগুলো বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলের এজেন্ট হিসেবেই কাজ করছে বললে অত্যুক্তি হবে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় নিরানব্বই শতাংশ ৬ বছর বয়সী শিশুই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। তার একটা বড়ো অংশ এখন দখল করছে বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যম স্কুল। এবং সে সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এবং অনেকক্ষেত্রে তারা ক্রেশের ভূমিকাও পালন করছে, একবছরের কম বয়সী শিশুদেরও রাখছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং কর্মী না থাকা সত্বেও। চাহিদা আছে এবং কোন তদারকি নেই। কাজেই চলতে অসুবিধা কি?

এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের পক্ষে সঙ্গত হত সরকারী ব্যবস্থাপনায় তিন বছর বয়স থেকেই বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা করা। কেরল যেরকম ব্যবস্থা শিক্ষা অধিকার আইন চালু করার সময় গোড়া থেকেই নিয়েছে। আর সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের ECCE নীতির সঙ্গে, ICDS -এর আদর্শের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। তা না করে, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজী মাধ্যম স্কুলও চালু করবেন। যেখানে বাংলা মাধ্যম স্কুলের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পানীয় জল, শৌচাগার, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থাই করে ওঠা যাচ্ছে না, সেখানে এরকম সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতীই বলতে হয়। নীতিগত ভাবেই ইংরেজী মাধ্যমের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই পৃথকভাবে করতে হবে, একই বাড়ী একই শিক্ষক একই ব্যবস্থা দিয়ে দুটোকে 'ম্যানেজ' করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

শহরাঞ্চলের ইংরেজী মাধ্যম বেসরকারী স্কুলগুলোতে শিশুরা কেমন আছে? কেমন শিক্ষা পাচ্ছে? তিন চার বছর বয়সের শিশুদের বিশেষ প্রয়োজন কি পূরণ হচ্ছে? ইদানীং তাদের নিয়ে প্রায়ই সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হচ্ছে,তা যথেষ্ট ভীতিপ্রদ এবং সার্বিকভাবেই তাদের 'শিক্ষা' নিয়েও উদ্বেগের যথেষ্ঠ কারণ আছে। মনে পড়ে যায় গুরুগ্রামের অভিজাত রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দশ বছরের ছাত্র প্রদ্যুম্ন ঠাকুরের স্কুলের শৌচাগারেই খুন হবার কথা, দিল্লীর দ্বারকায় চার বছরের শিশু ছাত্রীর যৌনাঙ্গে তারই সহপাঠীর হাতের নোংরা আঙুল এবং ছুঁচালো পেন্সিল ঢুকিয়ে বাচ্চা মেয়েটিকে দেহে-মনে ক্ষতবিক্ষত করার কথা। এ রাজ্যেই কাঁচড়াপাড়ায় ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর স্কুলবাসে যৌন নিগ্রহ এবং এরকমই আরও অনেক নানা দুঃসংবাদের কথা।

অতি সম্প্রতি কলকাতার অভিজাত ইংরেজী স্কুল জি ডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশনে চার বছরের ছাত্রীর যৌন নিগ্রহ এবং দুই শিক্ষকের অভিযুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে একেবারে বে-আব্রু হয়ে পড়ল কচিকাঁচাদের 'শিক্ষার' এইসব বেসরকারী স্কুলের নীতি-নিয়মের তোয়াক্কা না করা শিক্ষা-ব্যবসার চিত্রটা। জানা গেল যে কলকাতারই আর এক অভিজাত ইংরেজী স্কুল এম পি বিড়লাতেও কয়েকমাস আগে এক শিশুছাত্রীর যৌন নিগ্রহ ঘটেছিল, স্কুলেরই কর্মীদের দ্বারা। যথেষ্ট হৈ চৈ হলেও ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। ধামাচাপা পড়া এরকমই আরও নানা ঘটনা এ রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘটেছে বলেও প্রকাশ পেল। এই সূত্রেই দেখা গেল জি ডি বিড়লা স্কুলের একশ্রেণীর অভিভাবকের উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলন এবং ফতোয়া জারির প্রবণতা। সরকারী তরফেও প্রকাশ পেল চরম অকর্মণ্যতা এবং অসহায় আত্মসমর্পণের চেহারা। এই সব স্কুলে যে প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ ইত্যাদি থাকেন, তা জানা ছিল, কিন্তু জেনারেল ম্যানেজারও যে থাকেন তা অজানা ছিল। কিন্তু এঁরা ব্যবসা করেন না, ট্রেড লাইসেন্স এবং পুরকর চাইতে এসে পুরকর্মীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন! 'আন্দোলনের' জোরে অভিভাবকরা তাঁদের সমিতির স্বীকৃতি স্কুলের কাছে আদায় করতে পেরেছেন এবং প্রতি স্কুলে ক্লোজ সার্কিট টিভি ও গোপন ক্যামেরা এবং যৌন হেনস্থা রুখতে নজরদারি কমিটি গড়ার তড়িঘড়ি সরকারী ঘোষণায় আশ্বস্ত হয়ে বিপ্লবী অভিভাবকরা আন্দোলনে ইতি টানলেন—স্কুলের সব 'ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে'! নিয়মহীনতার নিয়ম পুন:প্রতিষ্ঠিত হল। আশ্বস্ত সব পক্ষই!

আশ্চর্যজনক যা, তা হল—কোন তরফেই কোন প্রশ্ন উঠল না, ৩—৬ বছরের কচিকাঁচারা তাদের জন্য প্রাপ্য বিশেষ যত্নাদি এবং বিকাশ ও নিরাপত্তার পরিবেশ পায় কিনা। তাদের স্কুলে অভিভাবকদের প্রাধান্য এবং নারীদের গুরুত্ব দিয়ে তৈরী যথাযথ পরিচালন সমিতি আছে কিনা, বাচ্চাদের

স্কুলে শিক্ষক, কর্মী, প্রশাসক-পরিচালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আছে কিনা। বড়োদের সঙ্গে একই স্কুলে থাকার ফলে বাচ্চারা যৌন নিগ্রহ ছাড়াও অন্য নানাভাবে উপেক্ষা অবহেলা হেনস্থার শিকার হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি।

অবশ্য সব জেনেবুঝেই অভিভাবকরা তাঁদের আদরের শিশুটিকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করে অনেক অর্থব্যয়ে এইসব নামী স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে হয়তো দু-চার বার শিশুটি ও অভিভাবক 'ইন্টারভিউ' দিয়ে বিফলও হয়েছেন। ফেল করা বা প্রত্যাখ্যাত হবার প্রতিক্রিয়া শিশুমনে কেমন হয় তা বুঝতে শিশু মনস্তাত্ত্বিকের দরকার পড়েনা। এরকম ক্ষেত্রে তিন চার এর ক্ষুদেরাও মা-বাবাকে প্রশ্ন করে—আমি কি ঐ স্কুলে যেতে পারব না মাম্মি? কেন মাম্মি?

না, ঐসব নামী-দামী স্কুলেও বাচ্চারা আনন্দে নেই, তাদের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের পথে নানা কাঁটা যে বিছিয়ে আছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। শিক্ষা-ব্যবসার এই সব বিশাল বিশাল কারখানা উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। লোকচক্ষু থেকে আড়াল করা কারখানাগুলোর গেটে ভারী লোহার দরজার ওপরের দিকে বড় জোর ফুট খানেকের ফোকড়, অভিভাবকদেরও প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। আর ভেতরটায় শিশুদের জন্য কড়া ডিসিপ্লিন, ধমক দিয়ে ঠাসা। অভিভাবকরাও তাতে বরং খুশিই। ব্যস্ত জীবনে তাঁরাও শিশুর 'অত্যাচারে' অতিষ্ট, বেয়াড়া প্রশ্নে উত্যক্ত, তাঁরাও তো শিশুর উপর মাঝে মধ্যে হম্বিতম্বি করে ফেলেন, হয়তো মারধরও। তাঁরা জানেন, শিশুটিকে এখন থেকেই ডিসিপ্লিনড হতেই হবে। অন্য অনেক শিশুর থেকে তাঁদের সন্তানটিই যে ভালো, সবাই পাশ করে গেলে কি তা প্রমাণ হয়? আর তাই তো ওদেরকে প্রথম শ্রেণীর আগেই পড়তে লিখতে, সংখ্যা চিনতে, গুণতে, যোগ-বিয়োগ করতেও শেখাতে হবে। স্কুল তাই করে; তাঁরাও নিশ্চিন্ত, প্রতিযোগিতার বাজারে তাঁদের সন্তানের নিশ্চিত সাফল্য কিনে ফেলা গেছে। ওদের স্কুলের ব্যাগটা একটু বেশী ভারি, ওদের সকাল বিকেল সন্ধ্যেটা টিউটরদের কাছে কাটছে, নিজে নিজে কিছু করবার, শিখবার সামান্য অবকাশও তাদের নেই। তা কি আর করা যাবে! না, এই 'ভাগ্যবান' শিশুদের শৈশবটাও সুন্দর, শিক্ষা আনন্দদায়ক, তাদের স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সৃষ্টিশীলতা এবং কৌতূহলী মনের পুষ্টি ঠিকঠাক হয়ে চলেছে—এমনটা ভাবা যাচ্ছে না।

এই দুই দল শিশু—একদল যারা প্রথম শ্রেণীর আগে কোন স্কুলিং পাচ্ছেই না বা কোন সরকারী ব্যবস্থায় মাঝে মধ্যে খাপছাড়া ভাবে পাচ্ছে, আর দ্বিতীয় দল যারা তিন-চার থেকেই ভালো স্কুলের তত্ত্বাবধানে আছে—তাদের বাইরে আছে তৃতীয় একটি বড় দল যারা মোটামুটি অঙ্গনওয়াদি কেন্দ্রে বা অন্য কোন সরকারী প্রাক-স্কুল শিক্ষাকেন্দ্রে অনেকটা সময় থেকেছে, অথবা সরাসরি প্রথমশ্রেণী বা বড়জোর 'শিশু শ্রেণীতে' ভর্তি হয়েছে—তাদের শৈশব ও শিক্ষা কেমন ধারা? আমরা তো দেখেছি কোন কিছুই ঠিকঠাক চলে না সেখানে, এটা নেই, ওটা নেই। শিক্ষকও নেই, যদি বা থাকেন তাঁর পড়ানোর 'মন' নেই, নতুন পদ্ধতি নতুন নিয়ম তাঁর মতে সর্বনাশা। অন্যরকম ভাবেন এমন শিক্ষকও আছেন হয়তো তবে তাঁরা অতীব সংখ্যালঘু। এই ডামাডোলের মধ্যেও শিশুর অভিভাবক তাকে ঠেলে পাঠায় স্কুলে, শিক্ষা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। খাওয়াটা অন্তত জুটবে, জুতো ব্যাগ সাইকেল টাকা সরকারী বদান্যতায় এসবও পাওয়া গেলে সংসারে একটু সাশ্রয়ই হয়!

পাশ ফেল থাকুক না থাকুক সব শিশুই যে মাধ্যমিক পর্যন্ত দশ বছরের শিক্ষা পাবে না, পেতে পারবেই না তা তো দুটি স্তরের (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং তার পরের) স্কুলের সংখ্যা আর পড়ুয়ার সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারী হিসেবে গণ্য স্কুল সংখ্যা যেখানে ৭৮০০০-এর মত, পড়ুয়া সংখ্যা ৭২ লক্ষের বেশী, (চার হাজার মত জুনিয়ার হাই স্কুল এবং তাদেরও পড়ুয়াকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে), সেখানে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের হাজার দশেক স্কুলে মোটামুটি স্থান সঙ্কুলান হয় ২৪ লক্ষ পড়ুয়ার। মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হয়, বড় জোর ১৫ লক্ষ মত (পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ এবং অন্যান্য বোর্ড/পর্ষদ মিলিয়ে)।

ফেল করানো এবং একই ক্লাশে রেখে দেবার নিয়ম না থাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হয়তো এখন ড্রপ আউট কম দেখানো যাচ্ছে কিন্তু নবম শ্রেণী থেকে আর সেটি করা যাচ্ছে না। সকলের জন্য ঠাঁই না থাকা একটা কারণ কিন্তু আরও বড় কারণ—একের পর এক সমীক্ষায় যা ধরা পড়ছে—লিখতে পড়তে না পারা, সাধারণ যোগ বিয়োগের অঙ্কও না করতে পারা যেসব পড়ুয়া এসে পড়েছে এতদূর তারা এবার মর্মে মর্মে অনুভব করে তাদের 'অক্ষমতা', হীনমন্যতায় ভুগে অবশেষে লজ্জাভয়ে পলায়ন করে। মা-বাবার বকুনি বা শিক্ষকের হম্বিতম্বিও আর কোন কাজে আসে না। এরা কারা? সমীক্ষা-তথ্য থেকেই পরিষ্কার যে এদের সিংহভাগই সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া অংশের, তপশিলী-জনজাতি গোষ্ঠীর। প্রাক্-স্কুল শিক্ষা যারা আদৌ পায়নি বা পেলেও নিয়ম নেই বলে যাদেরকে এ বয়সে প্রথাগত ৩-R-এর শিক্ষায় দীক্ষিত করা হয়নি। প্রথম শ্রেণীতে এদের এইসব প্রথম শেখার কথা

থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে তাও হয় না। সাধারণত, ধরেই নেওয়া হয় এগুলো তারা আগেই শিখে এসেছে। বহুক্ষেত্রে, প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ-পরিকল্পনা সেভাবেই নির্দেশ করে। পরের ক্লাশগুলোতেও এই ভুল শোধরানোর আর কোন উপায় থাকে না। বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকে না, শিশুরা সত্যিই ৩-৬ বছর বয়সেই প্রাক-প্রাথমিকেই দৌড়ে এগিয়ে থাকার শিক্ষা, ৩-R-এর শিক্ষা, পায়। উঁচু ক্লাশে তাই তাদেরই দাপট, সংখ্যায়ও তারাই বেড়ে চলে। এমনিভাবেই আমরা—শহুরে শিক্ষিত সম্পন্ন বড়রা সবাই মিলে ৩—৬ বছর বয়সীদের প্রাক্-স্কুল ৩-R-এর শিক্ষা এবং ইংরেজীকে অস্ত্র করে সব শিশুর জন্য লেভেল প্লেয়িং বা সুযোগসাম্যের সমস্ত সম্ভাবনা বানচাল করে দিতে পারছি। এবং তারস্বরে বলতেও শুরু করেছি ইংরেজী মাধ্যম সর্বভারতীয় বোর্ডে 'মেধা' চলে যাচ্ছে!

এমনটা হওয়া যে 'সব থেকে দামী সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া' এবং 'অমানবিক ও দুর্ভাগ্যনক' তা নজরে পড়ে আগন্তুক বিদেশী মরমী বিজ্ঞানীরও*, কিন্তু এত বড় বিপর্যয়েও আমরা স্বস্থানে অবিচলই থাকতে পারি।

সামগ্রিকভাবে, তাই, শিশুদের গোড়াপত্তনী শিক্ষা (এবং তার জেরে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই) বিপন্ন বললে খুব কি ভুল হবে? শৈশবকাল বিপর্যস্ত বললে কি তা বাড়াবাড়ি শোনাবে?

এর উপর যদি রাজ্যের সরকার স্কুলে স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী মাধ্যমের সমান্তরাল স্কুল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলে শিক্ষা আর শৈশবের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেওয়া যায়। তবে কি না এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু হয় তিলে তিলে অনেকদিন ধরে। ব্যথা সয়ে যায়, শেষে এক দমই লাগে না!

শহুরে শিশুদের ব্যথাহীন শৈশব-নাশী প্রকরণ আরও আছে। বায়ুদূষণের প্রকোপে কলকাতার দশটির মধ্যে চারটি শিশুই এখন শ্বাস-নালীর সমস্যায় বিপর্যস্ত। স্মার্টফোন এখন অনেক শিশুরই বেড়ে ওঠার নিত্যসঙ্গী। সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত না হলেও দেহে মনে তার দীর্ঘস্থায়ী কুপ্রভাব অস্বীকার করা যাবেনা।

* নোবেলজয়ী পদার্থবিদ ডেভিড জে গ্রস কলকাতায় এসে একটি বক্তৃতায় এমনই মন্তব্য করেছেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ জানুয়ারী, ২০১৮)

এবং বাংলা ভাষা

ওরে আমার গোবরাগণেশ আদরগেলা কোঁৎকা রে
ওরে আমার ফোকলামাণিক ছিঁচকাঁদুনে হোঁৎকা রে...
(সুকুমার রায়ের ভক্তকুল মাপ করবেন, তাঁরই ব্যবহৃত শব্দগুলোর জায়গা অদল বদল করেছি)।

পৃথিবীর সব মা'ই নবজাত শিশুকে নাচিয়ে দুলিয়ে আদর করার সময় এরকমই কিছু শব্দ উচ্চারণ করেন। শিশু তা চেটেপুটে গ্রহণ করে, তার মাতৃভাষায় দীক্ষা হয়। মনুষ্যজীবনের প্রথম দু-তিনটে বছর সাধারণত শিশুর কাটে মা এবং অন্য প্রিয়জনের সান্নিধ্যে। তার মধ্যেই সে শিখে যায় হাঁটতে ছুটতে খেলতে। কথাও বলতে। তিন পেরোতে না পেরোতেই সে কথা বলে কলকলিয়ে, হাসে খলখলিয়ে, কাঁদে ডাক ছেড়ে গাল ভাসিয়ে। গল্প শোনে চোখ বড় করে, আঁকিবুকি 'ছবি' দিয়ে ভরিয়ে তোলে ঘরের দেয়াল মেঝে হাতের কাছে যা পায় স-ব। এটা কি ওটা কেন প্রশ্নের তার শেষ নেই। আরও একটু বড় হতে হতে সে নিজেও বানিয়ে গল্প বলতে শুরু করে—চোখ পাকিয়ে হাত-পা নেড়ে। ভয় ধরানো বীরত্ব ফলানো সেসব গল্পে সেই নায়ক—ভূত পেত্নী রাক্ষস, বাঘ সিংহ সাপ, ছেলেধরা দুষ্টুলোক সব শায়েস্তা হয়ে যায় তার ঘুষি-লাথি বা অস্ত্রের আঘাতে! এতদিন শোনা সব ছড়া কবিতা গান ঝর্ণার মত বেরিয়ে আসে। প্রকাশে সে বাধা বন্ধহীন, ভয়-লজ্জাহীন, কুণ্ঠাহীন; কথা বলে জোরে জোরে চেঁচিয়ে। আশপাশের সকলকে ডেকে ডেকে শোনাতে চায় তার কথা কবিতা গান গল্প, দেখাতে চায় তার আঁকা 'ছবি'। ডেকে না পেলেই তার রাগ জেদ কান্না।

এহেন 'অ্যাক্টিভ' দস্যি শিশুকে সামলানো, প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয় না এখনকার শহুরে ছোট পরিবারের অভিভাবকদের পক্ষে। তাদের দিকে দেখতে গেলে, তাদের সব আব্দার মানতে গেলে নিজেদের কাজকর্ম বিসর্জন দিতে হয়। ফোন ইন্টারনেট ফেসবুক ট্যুইটার ইনস্টাগ্রামে ছেদ টানতে হয়। সেসব কি সম্ভব? অবশ্য অনেক সময় তার দরকার পড়ে না। বাচ্চাদের হাজারো প্রোগ্রাম অ্যাপস অ্যানিমেশন ভিডিও-তে ঠাসা আধুনিক স্মার্টফোন। শিশু সেগুলোর কদরও বোঝে, বেশ চুপচাপ সেসবে মেতে থাকে! এক জায়গায় চুপটি করে বসিয়ে রাখতে, খাওয়াতে বা ঘুম পাড়াতে স্মার্টফোনই ভূমিকা নেয় মা-বাবা দাদু দিদা ঠাম্মা-ঠাম্মির। শিশুভোলানো ছড়া-গান-গল্পের জন্য আধুনিক মায়েদের আর মাথা খুঁড়তে হয়না। সব মুস্কিলের এক আসান—স্মার্টফোন। অন্যদিকে শিশুদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতে স্মার্টফোন বা অন্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেট-

নিঃসৃত তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের অধিকতর কুফলের গবেষণা—তথ্যের স্তূপ জমতে থাকে।

কখনও সখনও উঁকি মারে মনে, এসব গ্যাজেট থেকে বিপদের কথা। কাগজে টিভিতেও শোনা যায়। সাবধানী হতে চেয়েও কূল পান না মা-বাবা, অভিভাবক। আরও কিছু উটকো বিপত্তির কথাও তাঁদের কখনও উন্মনা করে। ঐ তো অমুকের ছেলে, তমুকের মেয়ে নাকি দুবছরেও কথা বলতে পারে না। নিয়ে গেছিল স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে। ধমক খেয়ে ফিরে এসেছে ডাক্তারের কাছ থেকে, বাচ্চার সঙ্গে কথা বলেন, কতক্ষণ? তড়িঘড়ি প্লে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। ওমা, তিনমাসেই বাচ্চা দিব্যি কথা বলছে!

আর একটা ভয়ের কথাও কানে আসে। কচি শিশুরাও নাকি যৌন পীড়ন-নিপীড়নের শিকার হয় পরিবারের মধ্যেই, পরিজন আত্মীয় শুভানুধ্যায়ীদের হাতেই। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সব শিশু এভাবে শরীর-মনে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এবং সেটা মোটেই বিরল নয়—এমনই নাকি ধরা পড়েছে এদেশেরই নানা সমীক্ষায়।

নাঃ, তিনবছরের পর আর শিশুকে ঘরে রাখা ঠিক নয়। হাতের কাছেই যদি মেলে ইংরেজী প্লে-স্কুল বা নামী ইংরেজী স্কুলের হাতছানি? মুস্কিল আসান!

কিন্তু একদিকে সাবধান হতে গিয়ে যে শিশুকে অন্য বিপত্তির দিকে, অস্বাভাবিকতার দিকেই ঠেলে দেওয়া হল তা অনেকসময়ই ঠাওর করে ওঠা যায় না। স্কুলে দিদিমনিরা অভিভাবকদের ডেকে বলে দেন—ওদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলুন, চারপাশের সব কিছুকে ইংরেজীতেই চেনান। অথচ চারপাশের লোকজন সবাই তা করেন না, চারপাশের সব কিছু এবং মানুষজন স্বপ্নে তাদের ধরা দেয় মাতৃভাষাতেই। শিশু বিভ্রান্ত হয়, কুণ্ঠিত হয়। তার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত থাকেনা। কোন কোন বুদ্ধিমান শিশু সেটা আড়াল করতে চায় বাড়তি অ্যাগ্রেসন দেখিয়ে।

জীবনের প্রথম শিক্ষা মাতৃভাষাতেই পাওয়া পৃথিবীর সব শিশুরই জন্মগত অধিকার। সেটা কতদিন কিভাবে তা ঠিক করবেন বিশেষজ্ঞরা। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, চিন, জাপান, আমেরিকা সবাই তো শিশুর মাতৃভাষাতেই প্রাথমিক শিক্ষায় আস্থা রাখে। সেসবের তোয়াক্কা না করে যদি আমরা শিশুকে প্রথম থেকেই অন্য ভাষায় শিক্ষা নিতে বাধ্য করি, তবে স্নেহবশেই অবোধ অসহায় শিশুকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। 'শিক্ষা অধিকার আইন' যেন ক্রমশ বেশী বেশী সংখ্যক বাঙালী শিশুর অধিকার হরণের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। বড় হয়ে এইসব শিশুদের মধ্যে যদি মাতৃভাষার প্রতি অনাদর অবহেলা অবজ্ঞা জন্মে, তাহলে সেই ভাষাটাই দরিদ্র হয়ে যায়। শিশুর অভিভাবকদের প্রশ্রয় আনুকূল্য থেকেও বঞ্চিত হয় সেই ভাষা।

মাতৃভাষায় শিক্ষা আহরণের আনন্দ-শিহরণ বঞ্চিত কোন শিশু কি বড়ো হয়ে কোনদিন কোন উদাস অবকাশে তীব্র অভাববোধে আক্রান্ত হতে পারে? তাকে অধিকার বঞ্চিত করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি বিরূপ বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে পারে? সন্তানের সচ্ছলতা-ভরা জীবনের চিন্তায় আচ্ছন্ন যে অভিভাবক মাতৃভাষা-মুক্ত শিক্ষা বাণিজ্যের মধ্যে শিশু সন্তানকে নির্দয়ভাবে ঠেলে দেন তাঁরও কি কোনদিন চিত্তবৈকল্য ঘটতে পারে? বুকের ভেতর অচিন ব্যথা চিনচিন করে উঠতে পারে? হয়তো পারে, আর তখনই খোঁজ পড়ে রোমান হরফে ছাপা বেংলিশ 'আবোল তাবোল' বা 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'সহজপাঠ' বা 'পদি পিসীর বর্মী বাক্স'র। কিন্তু দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে?

'যত দূর সম্ভব মাতৃভাষায়' শিশুর শিক্ষার কথা বলেছিল শিক্ষা অধিকার আইন। 'as far as practicable'-শুধু কি এক সাবধানী শব্দবন্ধ? নাকি একটা অস্পষ্টতা, একটা আড়াল? একটা মস্ত সুযোগ? যে কারণে একটি সাঁওতাল বা কামতাপুরী শিশু শিক্ষারম্ভে মাতৃভাষা-বঞ্চিত হতে পারে, অনভিপ্রেত হলেও সেটা বাস্তব। কিন্তু যে সব শিশুর জন্ম বাংলা ভাষী (বা হিন্দী/তামিল / তেলেগু / মালয়ালম/ কন্নড়...ইত্যাদি ভাষী) পরিবারে তাদের অধিকাংশের বেলাতেই সেই সম্ভাব্যতা-বিচার প্রযোজ্য নয়। শিক্ষা-কারবারীরা এই অস্পষ্টতা আড়ালের সুযোগ নিয়ে ৬ বছর বয়সেরও অনেক আগে থেকেই কচিশিশুকে ইংরেজী-দুরুস্ত করে তোলার মোহ বিস্তার করেছে। খানিকটা বাধ্য হয়ে খানিকটা লোভে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অভিভাবকরা আটকে পড়ছেন সেই মোহজালে দলে দলে; কিন্তু দল-বেঁধে সন্তানের অধিকার অর্জনে টুঁ শব্দটিও করছেন না। ইংরাজীতে কেতাদুরস্ত হওয়া নয়, শিক্ষার সারকথা যদি হয় ভাবনা-চিন্তা করতে শেখা, পরিবেশে নিজের অবস্থান জানা বোঝা, তবে তার শুভসূচনা কেবলমাত্র মাতৃভাষাতেই সম্ভব। ইংরেজী বা অন্য ভাষা বর্জনের কথা বলছি না আদৌ। ৩-৬ বছরের কচিশিশুরা তো পৃথিবীর যে কোন ভাষায় ধ্বনি-ছন্দ-সুর-তালে তাল মেলাতে পারে ভালই এবং আজকের দিনে তথ্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে পেশাদারী দক্ষতায় শিশুদের কাছে সেগুলির উপস্থাপন শুধু সম্ভবই নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে।

শুধু বলছি এই স্তরে শিশুর সঙ্গে কমিউনিকেশনের মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত। তারপর ৮/৯/১০ বছর বয়সে ইংরেজীর অবতারণা কখন কিভাবে করা সঙ্গত তার সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশ এ দেশে এ রাজ্যে আছে। এবং সেসব অনুসরণ করে এখনও এ রাজ্যে দিব্যি চলছে এমন কিছু বাংলা স্কুল যেখানে শিক্ষার্থীরা ইংরেজীতেও যথেষ্ট দড়; মাতৃভাষা বাংলাকে যথাযথ মর্যাদায় শেখানো হয় এমন কিছু ইংরেজী মাধ্যম স্কুলও আছে এবং তাদের শিক্ষার্থীরাও বাংলা কারও চেয়ে কম শেখেনা। সেসবই অবশ্য অ-সরকারী স্কুল। কিছু সরকারী স্কুলেরও এই সুনাম ছিল। কিন্তু এখন তারা লুপ্তপ্রায়। এইসব নজির থাকা সত্বেও বলা হচ্ছে বাংলা স্কুলের চাহিদা নেই, ইংরেজী স্কুল খোলো। শিক্ষার মান কি এতে বাড়ছে? উচ্চশিক্ষা গবেষণা তরতরিয়ে এগোচ্ছে? স্ফূর্তি পাচ্ছে বাংলা ভাষা?

আমাদের চারপাশে বাংলা ভাষার দুর্দশার নানা চিহ্ন বা লক্ষণ আজ পরিস্ফুট। চোখ মেললেই দেখা যায়। মিডিয়া বিশেষত দৃশ্য-শ্রাব্য মিডিয়া একইসঙ্গে বাংলাভাষার রুগ্নতার শিকার এবং প্রচারক।

একটি দুর্লক্ষণ, যা সচরাচর সবার নজরে পড়ে না তা হল পাবলিক লাইব্রেরী—সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির দুর্দশা। সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষার মতই এইসব গ্রন্থাগারকেও আমরা মৃত্যুর দিকেই ঢলে পড়তে দিয়েছি। শিক্ষা, স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার ও বাহক গ্রন্থাগারগুলি নতুন জীবনের জন্য উন্মুখ, কিন্তু আমরা ফিরে তাকাই না। এও বাংলাভাষার বিপন্নতার দ্যোতক।

রবীন্দ্রনাথ 'শতবর্ষ পরে' তাঁর কবিতার কৌতূহলী পাঠকের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। নতুন কবির প্রতি জানিয়ে রেখেছিলেন শতবর্ষ পূর্বের অগ্রজ কবির 'বসন্তের আনন্দ অভিবাদন'। আজ কতজন সেই কৌতূহলী রবীন্দ্র কবিতা পাঠক? কে সেই নবীন কবি? আজ থেকে অর্ধশতক পরেও কি থাকবে কৌতূহলী কবিতা পাঠক, আসবে আমাদের ভাষা-আঙিনা ভরিয়ে দেওয়া নতুনতর কোন কবি? সেই দুর্মর আশাবাদী নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু ঝড়ো হাওয়া যে তীব্র গতিতে ছুটছে উল্টোদিকে! অন্তত, এপার বাংলায়, ভারতে, সে আশা দুরাশাই মনে হচ্ছে। তবুও.....

করব কেন হায় হায়, উত্তরণের আছে উপায়

তাই বলছিলাম, না-ই বা হোল ঘূর্ণিঝড় বা অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প বা জলোচ্ছ্বাস, না-ই-বা থাকল দুর্ঘটনা-মৃত্যুর মিছিল, কান্নার কলরোল, তবু চুপিসারে হামাগুড়ি দিয়ে ঘনিয়ে উঠেছে বিপর্যয়—শিশু-শৈশব-শিক্ষা-র, বাংলাভাষার বিপর্যয়।

প্রকৃতির অঙ্গ শিশুরা। মাতৃভাষা শিশু-প্রকৃতির অঙ্গ। এই সহজ সত্যকে মেনে শিশু-শৈশব-শিক্ষা-মাতৃভাষার নিবিড় সম্পর্ক লালনে যত্নশীল ও তৎপর বিশ্বের তাবৎ দেশ-জাতি। ভারত এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম, আজও, স্বাধীনতার ৭১ বছর পরও। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বাংলাও করেছে নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ।

কাগজে কলমে—সংবিধানে আইনে ৬-১৪ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষা-অধিকার স্বীকার-অঙ্গীকার করেও আমরা পালনে প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছি পদে পদে, ঘটে চলেছে অধিকার দিয়ে কেড়ে নেবার ছলনা।

কিন্তু আরও কচিশিশুদের—৩-৬ বছর বয়সীদের—ক্ষেত্রে সেটুকু ছল-আড়ালেরও দরকার পড়ে নি। তাদের যথাবিহিত বিকাশ আর শিক্ষাকে আমরা মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে গণ্য করিনি। তারা সরাসরিই মাতৃভাষাবর্জিত শিক্ষাবাণিজ্যের কাঁচামালে রূপান্তরিত। প্রকৃতির মত, না—মানুষদের মত এই কচিশিশুদেরও অধিকার লুঠ হতে অসুবিধা নেই। তাই প্রকৃতি আর শৈশব দুইই বিপন্ন।

এই অবস্থার বদল হওয়া আশু প্রয়োজন। সরকারী নীতি-নিয়ম পদ্ধতি অনুসারেই এখুনি সে কাজে নেমে পড়া সম্ভব।

৩-৬ বছর বয়সী শিশুর বিশেষ প্রযত্ন ও শিক্ষা-কে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্পষ্ট ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষা অধিকার আইনের সামান্য সংশোধনের মধ্যে দিয়েই তা হতে পারে।

তার জন্য বসে থাকার প্রয়োজন নেই। কেরলের মত যে কোন রাজ্য সরকারই পদক্ষেপ নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ নয় কেন?

এই কচিশিশুদের প্রযত্ন ও শিক্ষার 'কেন্দ্র' গড়ে তুলতে হবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় এবং নিয়ন্ত্রণে; কোন বেসরকারী স্কুলের 'জুনিয়ার সেকশন'-কে শিশু সংগ্রহ অভিযানে নামতে দেওয়া যায় না। সরকারী বিধিনিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত পেশাদারী পরিচালনায় পৃথক বেসরকারী কেন্দ্র চলতে পারে।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর ঘোষিত (২০১৩) কচিশিশুদের প্রযত্ন ও শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতি (National Early Childhood Care & Education Policy) -এক্ষেত্রে পথ দেখাতে পারে।

সার্বিক ও সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এই বয়সের সব শিশুর জন্যই-গ্রামের শহরের, সচ্ছল অসচ্ছল সব পরিবারের।

বেসরকারী কেন্দ্র ফি নিতে পারে সরকার নির্ধারিত হারে। প্রয়োজনে সক্ষম পরিবারের কাছ থেকে সরকারও ফি নিন।

এরাজ্যের ১ লক্ষ ১৬ হাজার ICDS (অঙ্গনওয়াদি) কেন্দ্রকে এরজন্য ঢেলে সাজানো যেতে পারে। শহরাঞ্চলেও অনুরূপ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে এই বয়সের সব শিশুদের স্থান করে দেবার জন্য।

বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া এই স্তরে কোন শিশুরই শিক্ষা ও যোগাযোগের মাধ্যম মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারবে না।

শিশুর অভিভাবক ও নাগরিকদের সচেতন হতে হয় যে ঘর বাড়ী উপকরণ-চাকচিক্য, বাজারী উচ্চমূল্য এবং ইরেজী মাধ্যম এসবের কোন কিছুই শিক্ষার গ্যারান্টি নয়, শিক্ষা কোনদিনই সম্পূর্ণ পণ্য হয়ে উঠতে পারে না; বুঝতে হবে যে প্রথম থেকেই ফার্স্ট হবার জন্য পড়ি কি মরি দৌড় শুরু করলে মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ারই সম্ভাবনা বেশী; নিজেদের স্বপ্ন সাধের বোঝা চাপিয়ে কচিশিশুকে দৌড় করানোর চেষ্টা করলে আদরের শিশুটির সর্বনাশ ডেকে আনার সম্ভাবনাই বাড়ে।

সরকারেরও তেমনি দায়িত্ব গুরুতর। জনমতের বিকার আর প্রকৃত জনমতের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। শিক্ষার, বিশেষত শিশুশিক্ষার মত ব্যাপারে প্রভাবশালীদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সুচিন্তিত নীতি-পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে চটজলদি সমাধানের পথে হাঁটা সরকারের কাজ নয়। সুদীর্ঘ বিচার বিবেচনার মধ্য দিয়ে গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত সুস্থায়ী নীতি পদ্ধতির অনুকূলে জনমত গড়ে তোলা, সর্বস্তরের মানুষের আস্থা অর্জন করাই সরকারের কাজ।

নির্বাচিত তথ্যসূত্র ঃ

- শিশুর শিক্ষা অধিকার আইন কি অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূর করবে—রবীন মজুমদার, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী (জানু-ডিসেম্বর ২০০৯)
- Early Childhood Education in India : A snapshot; Centre for Early Childhood Education & Development, Dr. B. R. Ambedkar University, New Delhi & Ors. (2013?)
- Investing in Our Children, Karoly L.A.& Ors, Rand (1998)
- Brain Development : The Early Years, Quality Matters, A Policy Brief Series on Early Care & Education, Vol.1, Wisconsin Council on Children and Families (2007)
- Educational Stitistics at a Glance, Govt of India (2016)
- Statistical Abstract, West Bengal (2013)
- ASER (Annual Survey of Education Report). 2016. PRATHAM.
- Elementary Education in India, Where Do We Stand, State Report Cards, 2015-16. National Univ. of Educational Planning and Administration, New Delhi (2016).

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, মনীষা গ্রন্থালয়, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট,

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদী বাগ)

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)

গ্রাহক চাঁদা— 180 টাকা (ডাকখরচ সহ) কলকাতার বাইরে চেকের জন্য অতিরিক্ত 30 টাকা

পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : 9830922194 বা 9331012537

শিক্ষা সংহার—১৯৭০ থেকে ২০১৮

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়
E-mail : sm.bmbg@gmail.com

সত্তরের দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষার প্রায় সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হবে না যে এই দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে বুনিয়াদি তথা বিদ্যালয় শিক্ষা প্রবলভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম, পাঠ্য পুস্তক এবং শিখন প্রণালী—এই তিন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত শিক্ষা সংহারের পটভূমি নির্মাণ করেছে। বর্তমানে এই বিষয়টি শিক্ষাকে সংকটের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

১৯৭২ সালের পুরোনো এগার ক্লাসের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা টাল-মাটাল। সদ্য সদ্য শিক্ষায় "নকশালী নৈরাজ্য"-র "অবসান" হয়েছে—কলেজে কলেজে সবুজ আবিরের আবাহন। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসন এবং কেন্দ্রের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের দপ্তরহীন মন্ত্রী, প্রয়াত শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের দিন ঘোষিত হলো। প্রায় ৬ মাস আগে স্থির হয়ে থাকা, নির্ঘন্ট মেনে পরীক্ষা গ্রহণের সব কিছু প্রস্তুত হওয়ার পর সিদ্ধার্থবাবু আচমকা ঘোষণা করলেন—নির্বাচনে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। অতএব দেশের-দশের-জাতির প্রয়োজনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পেছিয়ে গেলো প্রায় দেড়-দুমাস! অবশ্য ভারতীয় সংবিধান মতে সে বছর উচ্চ মাধ্যমিকের কোনও পরীক্ষার্থীই (দাদা-নেতারা এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম!) ভোট দেওয়ার বয়স অর্জন করেন নি।

এর আগের বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যখন শুরু হয়েছে, তখন শহর কোলকাতা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গ হয় ছাত্র-বিক্ষোভ, নতুবা বন্‌ধ ইত্যাদিতে উত্তাল। কিন্তু পরীক্ষা হয়েছে নির্বিঘ্নে। লুকিয়ে-চুরিয়ে নকল করা, যা চল্‌তি শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ, অবস্থাটা সেই সীমার মধ্যে বাঁধা ছিল। নকল করার সময় ছাত্ররা ধরা পড়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ জানিয়েছেন যে পরীক্ষার কেন্দ্রে গোলমালের সংখ্যা মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের ১ শতাংশের কম—পরীক্ষায় নকলের দায়ে অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোটে পরীক্ষার্থীর ২-৩ শতাংশের মধ্যে। পরীক্ষার ফল নির্ধারিত সময়ের দশদিন পর প্রকাশিত হয়েছিল—কারণ অবশ্য সেই সময়ে ঘোষিত নির্বাচনের জন্য খুনোখুনি! গণ-টোকাটুকির কোনও খবর ছিলো না। পরীক্ষা কেন্দ্রের জলের পাইপ বেয়ে কার্নিসে উঠে কাউকে "টুকলি সাপ্লাই করার" ছবি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি।

বাহাত্তরের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র আর আগের মতো রইল না। সিদ্ধার্থবাবুর উদাত্ত আহ্বানে যাঁরা ১৯৭২-এর নির্বাচনে জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন (সেই নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার অর্জন না করেই!) তাঁদের শেষ মুহূর্তের "পড়াশুনার ক্ষতি" পুষিয়ে দেওয়ার মহান প্রতিশ্রুতিও ধ্বনিত হলো ছাত্র আন্দোলনে একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়া সে যুগের দুই ছাত্র নেতার মুখে। "ক্ষতি পোষানোর প্রক্রিয়াটি" ছিল দ্বিমুখী। প্রথমত, এই প্রথম সেই সময় পর্যন্ত ১২ বছরের পুরোনো মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ইতিহাসের পরীক্ষার 'প্রশ্ন আউট' হলো, তাও বেসরকারি ভাবে এবং শাসক দলের নির্বাচিত কয়েকটি পার্টি অফিসে তা আগাম পাওয়া গেলো। যে ছাত্র বা ছাত্রবৃন্দ জাতির এহেন দুর্দিনে এই মহান নির্বাচন সংগ্রামে যত বেশি "সক্রিয় ভূমিকা" নিয়েছিলো, এই প্রকৃত এবং ন্যায্য অধিকার তারা তত বেশি ভোগ করলো। বিষয়টি জানাজানি হতেও সময় লাগেনি। কিন্তু ততদিনে বাংলা এবং ইংরেজি পরীক্ষা সমাপ্ত। কিন্তু পরীক্ষা দুটি বাতিল হলো না! আমি যে বিদ্যালয়ে পড়তাম, সেই বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্রে বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এই মর্মে দুজন অত্যন্ত প্রবীণ এবং শ্রদ্ধেয় বাংলার মাস্টার মশাই প্রধান শিক্ষকের সুপারিশ সহ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে লিখিত অভিযোগ পাঠান। কিন্তু ততদিনে সেই সংসদ নামক নকল বুঁদিগড়টির পতন ঘটেছে ক্ষমতার হাতে। পরীক্ষা যেমন চলছিলো, তেমনই চলতে থাকলো। দ্বিতীয়ত, এই বছর থেকে শুরু হলো "কৃষি বিপ্লব" এর বিপরীতে "টুক্‌লি বিপ্লব"। আমি যে

পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সেখানে পরীক্ষায় নজরদারীর জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিবর্তে জুলফিধারী, ''বাংলার সাগিনা''-র স্থানীয় শিষ্যবৃন্দ সেই গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে এসেই তাঁরা সেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ''পছন্দমতো ঘরে'' বসানর বন্দোবস্ত করেন। একই সঙ্গে বই এবং পুরিয়া, অর্থাৎ যে ছোটো ছোটো কাগজে পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর লেখা থাকতো, সেগুলি ''সাপ্লাই'' করার মসৃণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশাই ছিলেন পুরোনো ঘরাণার মানুষ, অতএব বাতিলের দলে। পরীক্ষা শুরুর প্রথম পর্বে তিনি ঘরে ঘরে হানা দিলেন—পাড়ার এবং বে-পাড়ার পাঞ্জু, সঞ্জু, ঝাঁকড়া, রতন, প্রমুখ তাঁকে যথারীতি ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করার চেষ্টা চালালেন। কিন্তু শিক্ষাব্রতী এই মানুষটি শিক্ষা-অন্ত প্রাণ। তখন যেন কিছুটা বাধ্য হয়েই আমার পাশের পরীক্ষার্থীটি, যিনি আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী নন, একটি দো-ফলা ছুরি পকেট থেকে বের করে সদর্পে হাই-বেঞ্চে বিঁধিয়ে দিয়ে সরাসরি বই খুলে লিখতে শুরু করলেন। বর্তমানে তিনি শাসক দলের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি!

সিদ্ধার্থ জমানায় বছর যত কাটতে লাগলো, টুকলি-বিপ্লব হয়ে উঠলো তত ব্যাপক, তার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়লো বাংলার কোণে কোণে। ইত্যবসরে, সেই সরকারি শাসক দলের মদতপুষ্ট যাবতীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ বন্ধ ঘরে, বেআইনী হোমসেন্টারে ''পরীক্ষা'' দিয়ে ওকালতি পাশ দিলেন। আজকের আলিপুর আদালতে আপনি যান, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে মধ্য বয়েসী উকিলবাবুদের মধ্যে অনেকেই এই জমানার ছাত্র নেতা!

এই মাৎস্যন্যায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল রেজাল্ট কেলেঙ্কারি, রেজাল্ট বেরুতে দেরির ঘটনাও। ১৯৭৪ সালে বিকম পরীক্ষার পাশের হার দাঁড়ালো ৮ শতাংশ—হ্যাঁ ঠিকই পড়েছেন, আট শতাংশ! কলেজগুলি থেকে এত রিভিউ-এর আবেদন জমা পড়তে শুরু করলো যে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলেজ পিছু রিভিউ আবেদনের সীমা বেঁধে দিল। আমরা যারা ১৯৭২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলাম, তাদের স্নাতক হওয়ার কথা ছিলো ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাস নাগাদ। কিন্তু সেই শিক্ষাবর্ষের স্নাতক পরীক্ষা শুরুই হলো ১৯৭৬-এর মে মাসে। রেজাল্ট বের হলো সেপ্টেম্বর মাসে—৪৮ শতাংশ ফল অসম্পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহাশয়, তৎকালীন ছাত্র পরিষদের এক দাপুটে ছাত্র নেতাকে পাশে বসিয়ে নিশ্চিন্তে সাংবাদিকদের বললেন যে, কেন? প্রেসিডেন্সি, সেন্ট জেভিয়ার্স, বেথুন, ব্রাবোর্ণ ইত্যাদি কলেজের পরীক্ষার ফল তো অসম্পূর্ণ নেই! বস্তুত সেই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ রিভিউ-এর আবেদন জমা পড়ে। স্নাতকোত্তর স্তরে আমদেরই অন্তত তিনজন সহপাঠীর রিভিউ-এর নম্বর এসে পৌঁছায় এক বছর পরে—এদিকে তাঁদের স্নাতক স্তরের নম্বরের ভিত্তিতে তাঁরা কয়েকটি মেধা পুরস্কার হারান!

১৯৭২ থেকে ১৯৭৬—এই দীর্ঘ সময়ে সিলেবাস বদল প্রায় হয়নি বললেই হয়। পাঠ্য পুস্তক, পাঠক্রম এই সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ে তখন মন্ত্রীসভার মাথা ঘামানোর সময় ছিলোনা। তখন চলতো যুব উৎসব, ঘুষ কেলেঙ্কারি এবং সরকার নিয়োজিত ওয়াংচু কমিটি সরকারি মন্ত্রীদেরই আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী করেন। এই সব বিষয় সামাল দেওয়াতে এবং গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সামলাতেই সময় চলে যায়। আমোদের দিন আর হুল্লোড় করে সময় কাটিয়ে, বেশ কয়েক লক্ষ শিক্ষিত বেকার তৈরি করে, পাড়ায় পাড়ায় ছিনতাইবাজ আর মস্তানদের ''রাজনৈতিক নেতা'' এবং ''শিক্ষাব্রতী'' হিসেবে সমাজে তাদের মান্যতা প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসের নিয়মে সেই কালরাত্রির অবসান ঘটিয়ে সিদ্ধার্থ জমানার আপাতত অগস্ত যাত্রা হলো।

ছাত্র সমাজ এমন সব কিছু বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলো এমনটা নয়। সেই অশুভ সময়ে যে অল্প কিছু নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও বিজ্ঞানী বিকল্প অনুশীলনের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকাতে পেয়েছি। বিকল্পের তাত্ত্বিক ধারণার পাশাপাশি তাঁদের ছিল বাস্তব অনুশীলনের অভিজ্ঞতা। এই দুই-এর যুগলবন্দীতে তাঁরা সহজেই সমাজে তাঁদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রেণীকক্ষ এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে প্রাত্যহিক

জীবনে বিজ্ঞানকে কীভাবে আরও আনন্দদায়ক করে পড়ুয়াদের কাছে উপভোগ্য করে তোলা যায়, এ বিষয়ে তাঁদের অনেক মৌলিক চিন্তা ছিলো। ছোটো, স্থানিক স্তরে তাঁরা অনুশীলনের কাজে যুক্তও ছিলেন। একসময়ে যখন আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা উঠে গিয়ে চিন্তা ও কর্মের জগতে স্বৈরতন্ত্রের ফাঁস কিছুটা আলগা হয়ে গেলো, তখন এঁরা আরও বড়, আরও ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজেদের মেলে ধরতে প্রয়াসী হলেন।

বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার হাল

১৯৬৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম পরিবর্তন ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কিছু কিছু প্রচেষ্টা নিয়েছিল—কিন্তু তা কোনো স্থায়ী রূপ গ্রহণ করার আগেই মন্ত্রীসভা দুটির পতন ঘটে। কংগ্রেসী ঘরাণার বাইরে গিয়ে নতুন করে শিক্ষা চিন্তার প্রকাশ ঘটানোর কথা শোনা যায় বামফ্রন্ট জমানায়। এই সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি বড় বড় পরিবর্তন রূপায়িত হয়। নানান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের কাছে মাথা নত করে পূর্ববর্তী কংগ্রেসী জমানায় বিদ্যালয় শিক্ষাকে পুনরায় আগের মতো ১০ বছরে প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তবে আগের স্কুল ফাইনালের পর প্রি-ইউনিভারসিটি স্তরটি তুলে দিয়ে দশম শ্রেণীর পর স্কুলেই আরও দু'বছর, বা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ানোর সুপারিশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে স্কুল ফাইনাল এবং প্রি-ইউনিভারসিটি স্তরটি উঠে যায় এবং নতুন করে মাধ্যমিক পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ গঠন হয়। এদের মূল কার্যক্রম শুরু হয় বামফ্রন্টের হাত ধরে, যদিও ১৯৭৬ সালে পুরোনো হায়ার সেকেণ্ডারির শেষ দল পরীক্ষা দেয় এবং ১৯৭৭ সালে দশ ক্লাসের নতুন দলের আবাহন ঘটে। পাঠক্রমে ঠিক কী গভীরতায় সমতা আনা, কোন্ বিষয় কোন্ স্তরে ঠিক কী গভীরতায় পড়ুয়াদের শেখানো হবে তা নিয়ে বামফ্রন্ট জমানায় প্রথম সাত আট বছর প্রচুর বিভ্রান্তি ছিল। পাঠক্রমের পাশাপাশি যে সমস্যাটি উঠে আসে তা হলো পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা। মাধ্যমিক স্তরে যে পাঠ্যপুস্তকের কথা ভাবা হয় তা পুরোনো, সময়সিদ্ধ ১১ ক্লাসের পাঠ্য বইগুলোরই রকমফের। সমস্যা দেখা দেয় ১১-১২ ক্লাসের ক্ষেত্রে। এই স্তরটির জন্য নতুন পাঠ্যবই প্রণয়ন করতে হয় এবং সেখান থেকে নানান বিভ্রান্তির জন্ম হয়। যে সমস্যাটি পড়ুয়াদের কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক ছিলো, তা হলো শিক্ষায়তনে যথেষ্ট সংখ্যায় শিক্ষকের সমস্যা। যদিও রাতারাতি বহু বিদ্যালয়কেই মাধ্যমিক স্তর থেকে নতুন ১১-১২ ক্লাসের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয় এবং বিপুল পরিমানে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, তাও শিক্ষকের সমস্যা থেকেই যায়। বামফ্রন্ট-এর শিক্ষানীতি চল্‌তো তাৎক্ষণিকতার ওপর ভিত্তি করে, কোনও দীর্ঘকালীন সুসংহত পরিকল্পনা ছাড়াই বড় বড় এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়মে পর্যবসিত হয়েছিলো। এমনই এক তাৎক্ষণিকতার ওপর ভিত্তি করে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ১১-১২ ক্লাস অতঃপর কলেজগুলিতে পড়ান হবে—যতই হোক কলেজ তো মহাবিদ্যালয়! "নামি কলেজের" অনেকেই এই ফাঁদে পা দেয়নি, ফলে সেখানে বিঘ্ন এসেছে কম। গড়পড়তা কলেজগুলি অতিরিক্ত পড়ুয়ার চাপে হাঁসফাঁস করেছে দীর্ঘদিন। এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছিলো শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবের বিষয়টি। পাঠক্রম এবং পাঠ্যবই পরিবর্তনের পাশাপাশি অবধারিত ভাবে পরিবর্তিত হয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। যে সমস্ত নবীন শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ১১-১২ স্তরে পড়াবার জন্য নিযুক্ত হলেন, বা কলেজের যে সমস্ত শিক্ষক ১১-১২ তে পড়াতে শুরু করলেন, তাঁরা পড়লেন সংকটে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমে, বিষয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতার মধ্যে ফারাক দুস্তর—এদিকে পাঠদানের সময়ও হয়ে এসেছে সংক্ষিপ্ত। কলেজের শিক্ষকরা পড়ুয়াদের পুরোনো এগারো ক্লাসে অধীত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়া শুরু করতেন এবং পুরোনো উচ্চ মাধ্যমিক (মানে আগেকার ১১ ক্লাস) ও স্নাতক স্তরের দুস্তর পার্থক্যযুক্ত পাঠক্রমকে সহনীয় করে তুলতে এক বছর বেশি সময় পেতন। কিন্তু এখন তাঁদের শুরু করতে হবে ১১ ক্লাসের স্তর থেকে, যেটি কলেজের জেনারেল কোর্স থেকেও কম। এহেন ধর্মসংকটে পড়ে কলেজে কলেজে

১১-১২ বিভাগ প্রথমে দুয়োরাণী হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে আবশ্যিক উৎপাত বলে পরিগণিত হয়। শিক্ষা-সংহারের সেই শুরু। বিদ্যালয় স্তরে ১২ ক্লাসের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তুলতেই কেটে গেলো পাঁচ বছর। না তৈরি হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচী, না তৈরি হলো প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত হ্যাণ্ডবুক বা ম্যানুয়াল। ১০ ক্লাস থেকে ১২ ক্লাসের দুস্তর বাধা সমস্যা থেকে সংকটের রূপ নিল। কোচিং সেন্টার, নোট বই-এ বাজার ছেয়ে গেল। এক সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের মনে হলো, শিশুরা যেমন মাতৃক্রোড়ে সুন্দর, তেমনি ১১-১২ স্কুলে স্কুলে চালানোই শোভন। অতএব এক ধাক্কায় সব কলেজ থেকে ১১-১২ পড়ানো উঠে গেলো, আরও নতুন নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হলো—একই পুরানো সমস্যা আবার ফিরে এলো। চক্রবৎ জগত কিন্তু পরিবর্তিত হয়েই চললো।

স্কুল স্তরের এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হলো পরবর্তী শিক্ষা স্তরটি যার মধ্যে পড়ে মানবিক বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা এবং অবশ্যই কারিগরি ও চিকিৎসা শিক্ষা। স্কুলস্তরের বাড়তি এক বছরকে হিসেবে আনতে কারিগরি স্নাতক স্তরকে কমিয়ে চার বছর এবং সেই একই পরিবর্তন এলো চিকিৎসা শিক্ষায়—এক বছর শিক্ষাবর্ষ এখানেও কমলো। যদিও পাঠক্রম রয়ে গেলো প্রায় অপরিবর্তিত। সেই কম সময়ে বেশি জিনিস "মগজে গজাল মেরে" গোঁজার চেষ্টা শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিন দশকের অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে বলা যায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকদের অপরিসীম পরিশ্রম এবং পড়ুয়াদের অদম্য উৎসাহে এই হিমালয়সদৃশ দেওয়াল অবশেষে অতিক্রম করা হয়ত গেছে—বিপুল পরিমাণে (সব অর্থেই) পরিহার্য ক্ষতির বিনিময়ে।

যে মানুষদের কথা আগে বলেছি, তাঁরা বামফ্রন্ট রাজত্বের প্রথম দিকেই আসন্ন মাৎস্যন্যায়ের আভাস পেয়ে শঙ্কিত হয়ে গঠনমূলক সমালোচনায় প্রয়াসী হন। মনে আছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষায় এই সময়কালে হাতে কলমে পরীক্ষার ওপর জোর এবং ঝোঁক ক্রমশ কমতে থাকে। এর বিরুদ্ধে বি-ও-বি সহ অনেক সংগঠনই সরব হয়। বি-ও-বি-র অনেকে উদ্যোগী হয়ে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলে বিকল্প অনুশীলনের পথ দেখান। বিকল্প শিক্ষা-প্রণালী নিয়েও কাজ শুরু হয়—এই বিশেষ ক্ষেত্রেও বিকল্প বয়স্ক বিদ্যালয়, শিশু-কিশোর শিক্ষা, বিকল্প পাঠক্রম, শিক্ষা-প্রণালী—এইসব কিছু নিয়ে যথেষ্ঠ গভীর স্তরে অনুশীলন চলে। সমাজে এই সব কাজের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার একটা আভাস মেলে, যখন দেখি এই সব কাজ এখনও চলছে, টিকিয়ে রাখার জন্য লোকবল কমলেও উদ্যোগগুলি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েনি। এমনই একটি বিকল্প উদ্যোগের আয়োজনে আহূত সাম্প্রতিক এক সভায় দেখা পাওয়া গেলো মধ্যযৌবনের এক ব্যক্তির, যিনি এমনই এক বিকল্প বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে উত্তরকালে কর্মরত। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাদের এই উদ্যোগটি কেমন ছিলো, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করানোর জন্য সপরিবারে হাজির ছিলেন। ছোটোবেলায় শেখা বিদ্যালয়ের গান আজও তাঁকে আকর্ষণ করে।

বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা-নীতির, যাকে বলে "এড-হক ইজম", সেটি শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের জন্ম দেওয়ার মূলে। যে কোনও সিদ্ধান্তই হতো তাৎক্ষণিক, ফলে সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে গেলে অতি অল্প সময়েই সিদ্ধান্তগুলির অবাস্তবতা এবং রূপায়ণযোগ্যতাহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। ফলে আবার দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন। এই পরিপূর্ণ নৈরাজ্যে সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। সকলের মনে পড়বে বি-ও-বি প্রকাশিত দুটি অসাধারণ কালোত্তীর্ণ পুস্তিকার কথা—প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল ও মাধ্যমিক শিক্ষার হালচাল। আজকের শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার হতশ্রী অবস্থার দিকে তাকালে মালুম হয় কী অশেষ দূরদর্শী ছিলেন সেদিনের সেই সব মানুষরা, ছেটো দুটো পুস্তিকায় ব্যবস্থার একেবারে গোড়ায় লুকিয়ে থাকা গলদগুলোকে কেমন নির্মমভাবে তুলে ধরেছিলেন।

পাঠ্যপুস্তককে সমতা আনার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের গাইডলাইন নির্মিত হয়েছে, কোন্ বিষয়ে কত লাইনে জ্ঞাতব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করতে হবে, তার সুস্পষ্ট নিদান দেওয়া হলো। সেই আদেশ শিরোধার্য করে যাঁরা পাঠ্যপুস্তক লিখলেন, তাঁরা পেলেন একটি করে টি. বি. সংখ্যা—টেক্সট বুক নাম্বারের সংক্ষিপ্ত বয়ান! প্রভাবশালী প্রকাশকবৃন্দ

"প্রভাব" খাটিয়ে তাদের রদ্দি বইগুলোর জন্য টি.বি. নম্বর সংগ্রহ করলো। যার হাস্যকর সমস্ত উদাহরণ, অন্তত পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে, সমকালীন (ছাত্রদের) পত্রিকা, বীক্ষণ-এ মিলবে। নতুন শিক্ষাক্রম, নতুন পাঠক্রম এবং সুষ্ঠু শিখন প্রণালীর পাশাপাশি সেই পদ্ধতিকে ক্লাস ঘরে নিয়ে যাওয়া, সক্রিয়ভাবে অনুশীলন করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়মিত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করার দাবি নিয়ে বিকল্প শিক্ষা-প্রণালীর অনুশীলনকারী শিক্ষাব্রতী মানুষরা দীর্ঘদিন সক্রিয় এবং সরব থেকেছেন।

এই সব শিক্ষাবিদদের চাপে এবং হাতে-কলমে কাজ জানা জ্ঞান-শ্রমিকের চাহিদা আন্তর্জাতিক স্তরে বাড়ায় জি. এ. টি. এস. চুক্তি (গ্যাট চুক্তির পরিষেবা সংক্রান্ত অংশ, যেখানে শিক্ষা একটি পণ্য এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত) অনুসারে ভারতের ওপর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক স্তর থেকে আবার দ্বিতীয়বার প্রবল চাপ আসতে থাকে। অন্যদিকে, ভারতের বিপুল জনসংখ্যার জন্য শিক্ষাবাজারের আয়তনটি আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নানান আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বা জি. ই. আর. বাড়ানোর তাগিদও উপস্থিত। এই দ্বিমুখী চাহিদা মেটানোর জন্য প্রথমে আসে যশপাল কমিটির নেতৃত্বে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ২০০৫—যেখানে শিক্ষা প্রণালী, পাঠক্রম, পাঠ্য পুস্তক, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়, যেটি কেন্দ্রীয় সরকার সহ প্রায় সমস্ত রাজ্য সরকারই মেনে নেয়। শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয় হওয়ায় রাজ্যসরকারগুলি এই সুপারিশ মোতাবেক তাদের পরিকাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগও গ্রহণ করে। ব্যতিক্রমী রাজ্য হিসেবে বামফ্রন্টের পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে প্রথমে কিছুই করেনি, বরং কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়ার জন্য লোকদেখানো আলঙ্কারিক ও বাহ্যিক কিছু চমকদারী পরিবর্তন করে, এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার প্রায় মুখে এসে "বাম" শিক্ষাব্রতীদের বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা উপলব্ধি হয়। বোঝা যায়, যে সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনড়, অচল অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে, এই সুপারিশটি সংহত উপায়ে ব্যবহার করলে সামনের দিকে তা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু ততদিনে দেওয়ালের লিখনে "পরিবর্তন"-এর আহ্বান, তাতে সামিল বিকল্প শিক্ষা-প্রণালীর সন্ধানী শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই।

এরপর হাজির হয় Right to Education Act-2009 বা শিক্ষার অধিকার আইন। এই আইনমতে শিশুদের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিৎ করার দায় সরকারের ওপর বর্তায় এবং কী মানের শিক্ষা, কী প্রক্রিয়ায় দেওয়া হবে তারও একটি মোটা দাগের রূপরেখা আইনটির একটি অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি ধারায় স্পষ্ট করা আছে।

মজার কথা হলো যশপাল কমিটি এবং শিক্ষা অধিকার আইন যা যা সুপারিশ করেছে, শিক্ষাবিদরা, যাঁদের অনুশীলনের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তাঁরা আরও সুষ্ঠু, শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত সংহত উপায়ে এবং রূপায়ণের দিক থেকে সরল, কার্যকর, প্রক্রিয়া এই সব সুপারিশের দু-তিন দশক আগে থেকেই অনুশীলন করে আসছিলেন। আগের সরকার এঁদের সহায়তা চায়নি এবং এই সব উদ্যোগকে তারা সন্দেহের চোখে বামফ্রন্ট-বিরোধী চক্রান্ত হিসাবে দেখতো। কিন্তু ২০১১ সালে পরিবর্তনের ঝড় এবং বিপর্যয়কারী সুনামির চূড়ায় আসীন হয়ে যাঁরা আমাদের রাজ্যটির কর্ণধার হলেন, তাঁদের চৈতন্যে আগের জমানার বিরোধী যাবতীয় মানুষ, যাবতীয় সংগঠন প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। বিশেষত, এই সমস্ত সংগঠন যদি এই পট পরিবর্তনের সপক্ষে স্বোচ্চার হয় তো গ্রহণযোগ্যতা আরও খানিকটা বাড়ে।

চলে আসা সব কিছুকে এক ধাক্কায় পরিবর্তনের যে জোয়ার আসে, তা প্রথম আছড়ে পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিবর্তনে। তারপর আসে শিক্ষা পরিচালন সংস্থাগুলির "পুনর্গঠন", নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্তে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বসানো, পাঠক্রম পরিবর্তন, মূল্যায়ন পদ্ধতির বদল এবং সবশেষে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং বিতরণে পুরাপুরি সরকারি আধিপত্য। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিকল্প শিক্ষা-প্রণালী নিয়ে কাজ করা শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই "পুনর্গঠিত" কমিটিগুলিতে ভীড় করেছেন যা সমাজের মানুষেরা নজরে এনেছেন। এই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ঠ আশার সঞ্চার করে—

অভিভাবক থেকে শিক্ষক সকলেই উৎসাহী হন এই ভেবে যে, এই প্রথম হয়ত প্রকৃত শিক্ষাবিদবৃন্দ, যাঁরা আধুনিক শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত এবং দীর্ঘদিন তা অনুসরণ করেছেন, তাঁরা দায়িত্ব পাচ্ছেন শিক্ষা পরিচালনায়। আমাদের আলোচনার শেষ দুটি বিষয় তাই হবে (ক) পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন এবং (খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রণালী।

পরিবর্তন ও শিক্ষা ভাবনা

যথেষ্ট সময় দিয়ে ফাটা ডিমে তা দিলেও শাবকের জন্ম হয় না; যদি হয় তবে তা বিকলাঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক। সময়ের সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যায়, যদি এই ধারণার মধ্যে সত্যের কণামাত্রও থাকতো, তা হলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭—এই দুই দশকে আমাদের রাজ্যে শিক্ষা বিষয়ে অনেক সদর্থক পদক্ষেপ করার নজির থাকতো। ১৯৭৭ থেকে ২০১১-এই সুদীর্ঘ কালের শাসনের জন্যও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু তা নির্ণায়ক উপাদান নয়—নির্ণায়ক উপাদান হলো শিক্ষা সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী! এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নটি সামনে রেখে আমরা এখন বর্তমান আমলে পাঠ্যবই প্রণয়ন, তাতে কী কী বিষয়, কেমনভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এবং তার ফল কী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করবো। এই আলোচনাটি জরুরি এই কারণে যে, এই সব বই প্রণয়নে বিকল্প শিক্ষা-প্রণালীর পথ প্রদর্শক শিক্ষাব্রতী মানুষরা বিভিন্ন ভূমিকায় উপস্থিত থেকেছেন, স্বভাবতই এইসব পাঠ্যপুস্তকে তাদের মূল্যবান ধারণাগুলি স্থান পাবে এমনটাই ধরে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে যখন পরিবর্তন ঘটাতে হয়, তা ঘটাতে হয় নিচ তলা থেকে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে, শুধু আমাদের রাজ্যে কেন, সারা দেশেই শিক্ষা প্রশাসনের গতি হচ্ছে ওপর থেকে নিচে। প্রশাসকরা, আমলাবৃন্দ প্রকৃত শিক্ষাব্রতীদের সুপারিশ বা অনুশীলনে বিশ্বাসী নন, তাঁরা সরকারি আদেশনামা এবং সরকারি কমিটির সুপারিশ—এই দুই বেদবাক্যের বাইরে পা রাখতে জানেন না। তাই যে কোনও পরিবর্তন অবধারিতভাবেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় সরকার মনোনীত কমিটির সদস্যদের প্রজ্ঞার স্তর দিয়ে। সরকারি কমিটির মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য সর্বদা পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি, কর্ম ও অনুশীলন মাপকাঠি হয় না— নেতার দ্বারা চট্-জলদি অনপ্রাণিত হওয়ার ক্ষমতাই অন্তর্ভুক্তি করণের সেরা মাপকাঠি। ওপর থেকে চাপানো সুপারিশ অতঃপর নেমে আসবে "বিশেষজ্ঞ কমিটি"-র স্তরে, যাদের ব্যাপ্তি আরও সীমাবদ্ধ। পুরো কার্যক্রমটি অন্তঃপর দাঁড়িয়ে থাকবে গুটিকয় মানুষের ভাসা ভাসা ধারণার ওপর, আরও অল্প ক'জনের ওপর যাঁরা এই ধারণাকে একটা কাজ চলা গোছের অবয়ব দেবেন এবং সেটিকে আপ্রাণ চেষ্টায় গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা চালাবেন এবং যারা রূপায়ণ করবে তারা আমলাতন্ত্রের বিশ্বস্ত সৈনিক, যারা এখন পর্যন্ত চলে আসা ব্যবস্থায় হাত পাকিয়ে নিশ্চিন্তে কালাতিপাতের তত্ত্বে আস্থাবান। অবস্থাটা তাই পুরোপুরি মাৎস্যন্যায়ের সঙ্গেই তুলনীয়, কেউই দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় সবাই হুকুম করেই নিশ্চিন্ত থাকেন। এই বিষময় চক্রটির অস্তিত্ব অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে বিকল্প অনুসরণকারী মানুষদের জানার কথা। তাঁদের হাত ধরেই আমরা পড়েছি, শিখেছি "Deschooling Society"-র মতো বই-এর কথা, জেনেছি পাওলো ফ্রেইরি বা বারবিয়ানার কথা। নড়বড়ে কাঠামোর ওপর পাঁচতলা কোঠা হয়ত তোলা যায়, কিন্তু ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায় প্রতি নিয়ত। বিষয়টি দ্রুত বিপর্যয়ের স্তরে পৌঁছে যায় যদি দেখা যায় যে ভিতের ইট তুলে সেই ইট ফুটো ছাদ ঢাকার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শিক্ষায় পরিবর্তনের সবচেয়ে শস্তা চমক হলো বাহ্যিক পরিবর্তন—যেটা সহজে চোখে পড়ে, যেটা মূল দর্শনের দারিদ্র্যকে বৈভব প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্তরালে ঠেলে দেয়। একটা ভুল নীতি, একটা ভ্রান্ত শিক্ষা-দর্শন, একটি আমলাতান্ত্রিক রূপায়ণ ব্যবস্থা যখন ব্যক্তি-কেন্দ্রীক স্বৈরতন্ত্রের বংশীধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় তখন সেই পূজার নৈবেদ্যতে সন্দেশের চূড়ার প্রয়োজনীয়তা পড়ে সমধিক। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিকল্প প্রণালীর অনুশীলনকারী শিক্ষাব্রতীরা পড়ে গিয়েছেন সেই অবধারিত ফাঁদে— তাঁরা নিধিরাম হয়েই রাজগৃহে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, এই কারণে যে তাঁরা এই সব কমিটিগুলিতে তাঁদের নিজস্ব সুপারিশ নিয়ে যান নি— আমলাতান্ত্রিক এক সুপারিশে শীলমোহর দেওয়া ছাড়া তাঁদের জন্য অন্য কি-ই বা নির্দিষ্ট থাকতে পারে! সর্দার পোড়ো পূর্বনির্ধারিত ছিল, যারা আমলাতন্ত্রের বর্ম পরে ঢাল তরোয়াল নিয়ে ছিলো পর্দার পেছনে।

পাঠ্য পুস্তক

প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণী—এই সব কটি শ্রেণীর সব কটি বই-ই এখন স্তরের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন পর্ষদ, পাঠ্যপুস্তক লেখক এবং প্রতিটি বই-এর পরামর্শদাতা মণ্ডলীর সহায়তায় নির্মাণ করে থাকেন। বইগুলির, বিশেষত পঞ্চম-অষ্টম স্তরে—একটি সাধারণ ভূমিকা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে (এখানে আমরা অষ্টম শ্রেণী ভূমিকাংশ উদ্ধৃত করেছি) ঃ

> জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষা অধিকার আইন-২০০৯ দলিল দুটিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্য পুস্তক গুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটির বিষয়-বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফল হল এই বইটি।
>
> এই বিজ্ঞান বইটি অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে ও নামকরণ করা হয়েছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। অতীব সহজ সরল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ, ভৌত ও জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন অভিমুখ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্রের নকশা ব্যবহার করে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যাতে তথ্য ভারাক্রান্ত না হতে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।....সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে।
>
> —পরিবেশ ও বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণী, ভূমিকা

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকছে বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক পাঠ্য পুস্তককে ঘিরেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এই বইগুলির হুবহু নকল পি ডি এফ ফাইল হিসেবে পাওয়া যায়। এই লেখায় অন্তর্জালে লভ্য ঐ ফাইল গুলির পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। সক্রিয়তা ভিত্তিক এবং কর্মপত্র মারফৎ পড়ুয়াদের জ্ঞান ও বোধমূলক অগ্রগতি যাচাই-এর মূল মন্ত্র হলো একটি স্তরের অধীত বিদ্যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী স্তরটি নির্মাণ। হাতে-কলমে কাজ করে, বিভিন্ন অবস্থায় নানা পরীক্ষা করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে পড়ুয়ারা বৈজ্ঞানিক সূত্রের সর্বজনীন চরিত্র সম্পর্কে যেমন ধারণা পায়, তেমনি পরীক্ষার সাফল্য-ব্যর্থতা যে পরীক্ষা-পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল, সে সম্পর্কেও ধারণা পায়। ঠিক এ কারণেই ন্যূনতম তথ্য থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে পড়ুয়ার তথ্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এক যৌক্তিক পদ্ধতিতে; আপাত সম্পর্কহীন তথ্য মাথায় রাখার নিরানন্দ প্রক্রিয়া থেকে তার মুক্তি ঘটে। বস্তুত "শিখন পরামর্শ" শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে ঃ

> তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণীতে শুরু হয়েছে শিশুর পরিবেশ চর্চা। নানা রকম হাতে-কলমে কাজ, অনুসন্ধান, আদান-প্রদান, কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তার চার পাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। আমরা চেয়েছি তারা দল বেঁধে কাজ করুক। আরও চাওয়া হয়েছে যে শিশুর জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়া যেন কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক নির্ভর না হয়।....
>
> আশা করা যায় শিক্ষার্থীর ইতিমধ্যে যতটুকু জ্ঞান, মূল্যবোধ ও দক্ষতা গঠন সম্পন্ন হয়েছে, তার ফলে সে এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। হয়ত এর ফলে শ্রেণী কক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় আপনাদের আরও বেশি করে নানারকম দলগত কাজের আয়োজন করতে হবে। 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ে নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলতে ওদের উৎসাহ দিন। সেগুলো সংরক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষের একটি অংশ ব্যবহার করুন।....শিক্ষার্থীদের বিকাশ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে আপনি প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন করতে পারবেন।
>
> (শিখন পরামর্শ অংশ, জোর আমাদের)

ভূমিকা এবং পরামর্শ—এই দুই অংশ থেকে যা বেরিয়ে আসছে—

১। সক্রিয়তা-ভিত্তিক হাতে কলমে কাজ—যেটির অভাব আমরা বি-ও-বি'র পক্ষ থেকে ১০ এবং ১১-১২ পাঠক্রম তৈরি সময় লক্ষ্য করে কঠোর সমালোচনা করেছিলাম সঠিক ভাবেই,

২। শিক্ষক ও পড়ুয়ার মধ্যে আদান-প্রদানের সময় বাড়ানো,

৩। বেশিরভাগ সময়েই শিক্ষক হবেন শিক্ষাক্ষেত্রে অনুঘটক—সক্রিয় পড়ুয়া তার জ্ঞাতব্য বিষয় নির্মাণ করে নেবে,

৪। শুধু পাঠ নয়, শিখন পদ্ধতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ,

৫। মূল্যায়নের পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন।

বর্তমান পাঠ্যবইগুলির জোরের জায়গাগুলো আগে বলে নিই, নইলে আলোচনা এক নিষ্ফলা একতরফা সমালোচনায় পর্যবসিত হবে। প্রথমত, বর্তমান পাঠ্য পুস্তকগুলিতে আচমকা তথ্য পরিবেশন করার অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর প্রবণতা যথেষ্ঠ সচেতনতার সাথে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা রয়েছে। সাফল্য কতটা এসেছে তা বিতর্কিত। অপাঠ্য ভাষা, কল্পনাহীন দুর্বোধ্য সাদা-কালো ছবির পরিবর্তে রঙিন কল্পনা-প্রসূত সুপ্রযুক্ত ছবি পড়ুয়াদের আকৃষ্ট করবে, পঞ্চম-সপ্তম শ্রেণীতে কাহিনীর মাধ্যমে বিষয়ে উপস্থাপনা পড়ুয়াদের মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক হবে। ছাপা ভালো, লাইন ড্রইং-এ দক্ষতার ছাপ রয়েছে, বইগুলির জীবনকালও দীর্ঘ হবে। সেই দিক থেকে বর্তমান প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়—অন্তত পড়ুয়াদের বিষয়গুলি গভীরে জানবার জন্য পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক হবে বলেই মনে হয়।

কিন্তু পুরো কার্যক্রমটি কতকগুলোর গুরুতর ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভ্রান্তির উৎস শিক্ষা সম্পর্কে, শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে, শিক্ষা দান ও শিক্ষক সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি বিশেষ আমলাতান্ত্রিক মনোভাব। সেই কারণেই শিখন পরামর্শ অংশে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এইসব শব্দবন্ধ, ''আশা করা যায়'', ''হয়ত'' এবং ব্যক্তি শিক্ষকের ওপর অতি নির্ভরতা! শিক্ষক-প্রশিক্ষণের অভাবে শ্রেণীকক্ষে পড়ুয়াদের সক্রিয়তা-ভিত্তিক বোধ ও জ্ঞানমূলক বিষয়গুলি আয়ত্ব করা অসম্ভব হয়ে উঠে। বর্তমানে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের যে বাতাবরণ, তাতে যেভাবে এই নতুন পাঠ্যপুস্তকগুলিকে জ্ঞান-নির্মাণ প্রক্রিয়ার সহায়ক রূপে ব্যবহার করা যায়, যে পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষক পড়ুয়াদের জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করতে পারে, সেই বাতাবরণটিই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। না সুযোগ রয়েছে ব্যক্তি সক্রিয়তার, না সুযোগ রয়েছে দলগত সক্রিয়তার। অথচ কেবল পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে সেই জ্ঞান এবং বোধ আয়ত্ত্ব করার পুরো উপাদান বর্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলিতে সম্পূর্ণতই অনুপস্থিত। তাই সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতি, সঙ্গে শিখন-প্রণালী মুখ থুবড়ে পড়ে। এই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতি এড়িয়ে গিয়ে তো আর নতুন শিক্ষা পদ্ধতি রূপায়িত করা যায় না।

২০০৫ এবং ২০০৯-এর সুপারিশে শ্রেণীকক্ষে পড়ুয়া এবং শিক্ষকের যে অনুপাত নির্দিষ্ট করেছে, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে তা বর্তমান। পড়ুয়া এবং শ্রেণীকক্ষের যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা, বেসরকারি সমীক্ষা বলছে যে বর্তমান হার বজায় থাকলে তা হয়ত ২০২৫ সালে ছুঁতে পারা যাবে! যে ধরণের শিক্ষা-প্রশাসন বিদ্যালয়ে থাকলে দ্রুত সিদ্ধান্তে নিয়ে পঠন এবং শিখন পদ্ধতিতে বদল আনা যায়, তা মাত্র ৩০ শতাংশ বিদ্যালয়ে আছে—প্রতি ১০টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পিছু ৭টি প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তে কোনও একজন শিক্ষক সেই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, ফলে সেই বিদ্যালয়ে আসলে একজন পূর্ণক্ষণের শিক্ষক কমছে। বালিকা বিদ্যালয়ে বা সহ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে কন্যাশ্রী ইত্যাদির চাপে স্কুলের জায়গা এবং পঠনের সময় কমে এসেছে। খেলার মাঠ পর্যবসিত হয়েছে সাইকেলের গুদামে, প্রতিদিন ৩ শতাংশ পড়ুয়ার অভিভাবক হয় ব্যাগ বা সাইকেল নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন—টাকা-পয়সার হিসেবে রাখতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা জেরবার। শিক্ষাবর্ষে শ্রেণীর তিনটি মূল্যায়ন, বছরের শেষে ''সামেটিভ'' মূল্যায়ন। হাতে-কলমে পরীক্ষা, প্রকৃতি পরিচয়, ''ফিল্ড ভিজিট''—এসব তো সোনার পাথরবাটি।

মনে রাখতে হবে যে এই পুস্তকগুলি নির্মাণের সময়ে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রশ্ন ছিলো না। তাই এই পদ্ধতিতে পড়ানো এবং শিখন পদ্ধতির সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতার কোনও বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়ন করার সুযোগ ছিলোনা; বস্তুত, এই প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন হয়নি। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর শেষে মূল্যায়নের প্রশ্নটি এসে যায়। সরকারও বিলক্ষণ বোঝেন বিষয়টি। তাই অষ্টম শ্রেণীর বইতে ''মেড-ইজি'' দেওয়া আছে।

বই-এর শেষে ''তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি'' বিষয়টি এই ''নতুন'' শিখন পদ্ধতি নিয়ে সরকারি ধারণা একেবারে প্রাঞ্জল করে দিয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় থেকে কত নম্বরের প্রশ্ন করতে হবে এবং পড়ুয়াদের বই-এর কত পাতা থেকে কত পাতা পড়তে হবে, তার এক বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে। আবার প্রতিটি অধ্যায়ে বোধমূলক, জ্ঞান-মূলক এবং নির্মাণ মূলক অংশ বিভিন্ন রং ব্যবহার করে লেখা হয়েছে। শেষ বিচারে দাঁড়াচ্ছে অধ্যায় পিছু সব মিলিয়ে নীল রং দিয়ে লেখা একপাতা শিক্ষক দাগ দিয়ে দিচ্ছেন, পড়ুয়া অন্য কারুর সহায়তায় তা মুখস্থ করছে এবং মনে রাখার মতো বিষয়ের পরিমাণ কম থাকায় তারা দলে দলে পূর্ণমান পেয়ে যাচ্ছে। সব কিছুই বৃথা যাচ্ছে কেবলমাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাবে, শোনা যায় এই প্রশিক্ষণের নাকি অর্থ ধরা নেই। বাস্তব-বিবর্জিত কল্পলোকের সঙ্গে রূঢ় বাস্তব এবং সমঝোতার যোজ্যতায়! যতদূর জানা যাচ্ছে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটা দুটো লোক-দেখানো কর্মশালা সংগঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কর্মশালা গুলিতে যে সব প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা নতুন পাঠ্যবই এবং নতুন শিক্ষন পদ্ধতি, এই দুটি বিষয়েই সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না। অতএব এগুলি ফলপ্রসূ হয়নি। তারপর এই লোক দেখানো প্রয়াসও চলেনি। বেশিরভাগ শ্রেণীকক্ষে সেই চক্ আর বোর্ড পদ্ধতি আর 'রোট লারনিং'। আগের পদ্ধতিতে তবু ছিলো তথ্যের ভার, ছিলো অতিরিক্ত পাঠ তালিকা এখন আর তার সুযোগ নেই। ফলে নতুন শিক্ষা, পুরোনো পদ্ধতিতে শেখাতে গেলে তা না হয়ে উঠছে শিক্ষা না হয়ে উঠেছে প্রক্রিয়া। তাই সমীক্ষা দেখাচ্ছে অষ্টম শ্রেণী পাশ পড়ুয়া পঞ্চম শ্রেণীর থেকেও কম জ্ঞানের অধিকারী—এখানে ঐ ''আশা করা যায়'' এবং ''হয়ত'', পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এবং শিখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই দুটি স্বীকার ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য তাতে মল-কালচার এবং ব্র্যাণ্ড সচেতন কিন্তু নাগরিক হিসেবে সম্পূর্ণ অচেতন নির্বোধ ''জনগণ'' নির্মাণের সংগঠিত সবকটি প্রয়াসে বহুজাতিক সংস্থাগুলিরই সুবিধে। নানা উৎসব এবং হুল্লোড়ে অভ্যস্ত এই বিশাল অপচিত তারুণ্যের প্রবাহ কলেজে ভর্তির জন্য নিজেদের নড়বড়ে শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন। আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং মেধার অনাস্থা থাকা এই পড়ুয়াকুল অভিভাবকদের রক্ত-জলকরা টাকা দাদা-দিদিদের প্রণামী দিয়ে উচ্চ শিক্ষার তরণী চড়ে পাড়ি জমাচ্ছেন অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের দিকে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় যে বিকল্প শিখন পদ্ধতিকে এক সার্বিক পদ্ধতি, একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিয়ে যাঁরা বিকল্প অনুশীলন করতেন, তাঁরা উপদেষ্টা থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য এবং ফলের মধ্যে এই দুস্তর এবং প্রায় অ-প্রত্যাহার যোগ্য ব্যবধান ঘটলো কি করে।

বস্তুত, এমনটা ঘটাই ছিল ভবিতব্য। বর্তমান ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে রাজনৈতিক ভর্তুকির ওপর, যার মূলমন্ত্র কোথাও কোনও মূল্যায়ন থাকবে না। শিক্ষকরা ছাত্রদের মূল্যায়নে বঞ্চিত হবেন, নাগরিকরা রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মূল্যায়নে অপারগ হয়ে উঠবেন। শ্লোগান পড়তে পারা চল্‌তি ফ্যাসান আয়ত্ত করতে পারা কর্তাভজা একদল বোধহীন দঙ্গল, বা পরিভাষায় ''ব্রুট মেজরিটি'' নির্মাণই যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে যে কোনও পরিবর্তন অবধারিতভাবে শিক্ষাকে আরও তরল করা, আরও লঘুকরণ করা ছাড়া কার্যত অসম্ভব। এই কাজে সমাজ, অভিভাবক এবং শিক্ষাব্রতীদের সম্মতি আদায়ের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ, সুষ্ঠু এবং পরিষ্কার চরিত্রের অধিকারীদের কেবল মাত্র যোগদান, আলঙ্কারিক অর্থে, অন্য কোনও সদর্থক বা সমার্থক অর্থে নয়। অন্য শিক্ষা-প্রণালীর পথ দেখানো শিক্ষাব্রতীরা এই ভ্রান্ত ব্যবস্থার জন্য সেই প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছেন সর্বাংশে নেতিবাচক

অর্থে এবং সন্দেহ নেই সমালোচিত হয়ে এখন পস্তাচ্ছেন। যে সমস্ত ভয়ঙ্কর বিষয় তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে, তার তালিকা দীর্ঘ—বইগুলিতে এমন বিষয় ছড়িয়ে আছে, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা দিলে তা বইগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে। এখন এই বইগুলি সবই অর্ন্তজালে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে পঞ্চম শ্রেণীর "আমাদের পরিবেশ" বইটির অন্তর্জাল সংস্করণের পৃষ্ঠা ৩১ খুলুন। নীল রং-এ লেখা অংশে (বোধ মূলক অংশ) দেখবেন বলা আছে "অস্বাভাবিক উপাদান", হয়ত বোঝাতে চাওয়া হয়েছে কৃত্রিম উপাদান। উদাহরণের অভাবে "অস্বাভাবিক উপাদান" পড়ুয়াদের অধরা থেকে যাবে। পৃষ্ঠা ৫৮-তে জীবজগৎ সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া আছে তা পরিবেশ-প্রতিবেশ বিরোধী ধারণা। জীব জগতের প্রয়োজনীয়তা মানুষের চাহিদা মেটানো নয়—এমন উপযোগিতার দৃষ্টিতে যদি ছোটো বয়েস থেকেই পড়ুয়ারা পরিবেশকে দেখতে শেখে, তা হলে তারা যখন নীতি-নির্ধারক হয়ে উঠবে, তখন পরিবেশের কী হাল হবে ভাবলেও ভয় লাগে। পৃ. ৯৯-তে "স্মরণীয় যাঁরা" শীর্ষক অংশে যে মারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে বেরিয়েছে তা শিশু মন পার্থেনিয়ামের চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করে নেবে। কেন এঁরা স্মরণীয় তা শিশুরা বুঝবে না, বিন্যাসে কোনও ক্রম নেই, ব্যাখ্যা নেই, স্মরণীয় কেন তার কোনও বর্ণনাও নেই। একজনও আদিবাসী তপশিলী জাতি-উপজাতির নেতা এই তালিকায় উপস্থিত নেই। অনেক পরে, ১০৫ পৃষ্ঠায় এই বিষয় ফিরে এসেছে, আলাদা অধ্যায়ে। এই যে "অপর" করে রাখার অপ-শিক্ষা, এই নির্মম রসিকতার কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষত যখন দেখা যায় "স্মরণীয়" দের জন্য ব্যয় করা শব্দ সংখ্যা প্রায় ৫০০ আর "নতুন অধ্যায়ে" শব্দ সংখ্যা ২৭০ টি? সবচেয়ে শোচনীয় উদাহরণটি হলো ১১০ পৃষ্ঠায়। সবুজ বিপ্লবকে এরকম গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টা কীটনাশক সংস্থার বা ব্যবসায়িক সারের প্রচার মূলক পুস্তিকাতেও পাওয়া যায় না। পৃ.১১৭-তে হঠাৎ দামোদর ভ্যালি করপোরেশন নিয়ে এত কথা বলার কী প্রয়োজন তা বোঝা গেলো না, বিশেষত অসমর্থিত, অবৈজ্ঞানিক, সরকারি প্রচারমূলক বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে পড়ুয়াদের মেগা প্রকল্প সম্পর্কে 'ইনডক্ট্রিনেট" করাই কি তাহলে উদ্দেশ্য? বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিৎভাবেই মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা পাননি, নাকি অন্য কিছু? ফলে যা দাঁড়ালো তা হলো সংক্ষেপে এই রকম—বইটির অঙ্গসজ্জা থেকে বহিরঙ্গের পরিবর্তনের দাবিদার হবেন বিশেষজ্ঞ কমিটি, আর খামতি, ভ্রান্তি এবং কুশিক্ষা মূলক যে সমস্ত অসংখ্য মণি-মুক্তো বইগুলির প্রতিটি অধ্যায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে এই "পরামর্শদাতা"-দের ওপর, যাঁদের উপস্থিতি কেবলই আলঙ্কারিক ! এ যেন নর্দমার জল অগ্নি-নির্বাপনে ব্যবহার করতে গিয়ে সেই জলে স্নান করে নেওয়া!

বর্তমান পদ্ধতিতে "শিখছে" তারাই যারা পুরোপুরি তিন চার পাঁচ জন গৃহশিক্ষক নির্ভর। শিক্ষায় শ্রেণী বিভাগ আরও পাকা হওয়ার দিকে যাত্রা করেছে। কেবলমাত্র শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ পদানত ভারত জগৎ সভায় একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি আর স্বাস্থ্যের কারণে প্রবল নয়, তা শিক্ষা ক্ষেত্রেও ছাপ ফেলেছে। প্রবণতাটি দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা এখন আর একটি গুণ নয়—বশ্যতা গুণ হিসেবে নন্দিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের মূল বিষয় হচ্ছে কর্তৃত্বকে অস্বীকার, যা চলছে তাকে প্রশ্ন করা। সমাজে প্রশ্নহীন আনুগত্যকে মান্যতা দেওয়ার জন্য শিক্ষা হলো এক প্রমাণিত হাতিয়ার—তাসের দেশের রাজত্ব পাকা করার এক নিশ্চিৎ প্রক্রিয়া। এই ক্ষোভ অনেকেই প্রকাশ করেছেন যে প্রকৃত শিক্ষাব্রতীরা পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েও তা অনেকাংশে নেতিবাচক প্রভাবে পর্যবসিত হলো, তা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে নান ট্র্যাজেডির সঙ্গে এক সারিতে পড়ে গেল! অভিভাবকসহ অনেক শিক্ষাব্রতীর এই মূল্যায়ন অযথা কঠিন মূল্যায়ন, নাকি তার সারবত্তা রয়েছে, ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে।

‘কুসংস্কার’ বিরোধিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করাঃ কোলকাতা ১৯৮৪ এবং নিউ ইয়র্ক ২০১৬

সুদীপ্ত সরস্বতী

সমাজের চলে আসা ‘কুসংস্কার’গুলি দূর করার জন্য আন্দোলন করেন—এমন বেশ কিছু মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে চোখে পড়ে। এরই পাশাপাশি এইসব আন্দোলনের সমালোচনাও চলতে থাকে। এমনই দু’টি আন্দোলনের সমালোচনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই লেখার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং আমেরিকা—পৃথিবীর এই দুই প্রান্তের কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে ৩২ বছরের ব্যবধানে দু’জন সমালোচক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। স্থান ও কালের এতোখানি ব্যবধান সত্তেও দুই সমালোচনার মর্মবস্তুতে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্য রয়েছে সমালোচনার প্রতিক্রিয়াতেও। দুই জায়গাতেই আন্দোলনের অনেক নেতা ও কর্মীরা সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় যে আচরণ প্রকাশ করেছেন, তা সমালোচনা এবং সমালোচকের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতার নিদর্শন। দুই দেশের দুই সমালোচকের সমালোচনায় সাদৃশ্য আর পার্থক্য কোথায়? সাদৃশ্যের তাৎপর্য কী? সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় দুই প্রান্তের দুই দেশের কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনকারীদের আচরণে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার তাৎপর্যই বা কী? এসব নিয়ে আলোচনাই এই লেখার উপজীব্য।

গত শতাব্দীর আশির দশকে যখন পশ্চিমবঙ্গে ‘কুসংস্কার’ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল, সে সময় ১৯৮৪ সালে ‘কুসংস্কার’ বিরোধিতার চরিত্র নিয়ে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে সৌমেন গুহ ‘বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী’ (সংক্ষেপে বি.ও.বি) পত্রিকায় কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন। লেখাটির নাম “‘কু-সংস্কার’ বিরোধিতা কোন্ পথে?”—প্রকাশিত হয়েছিল বি.ও.বি.-র মে-জুন ১৯৮৪ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৪-১৮)। (লেখাটি ‘বিজ্ঞান, মানুষ ও সমাজ’ নামে একটি ই-বুকেও সম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে—URL: https://sites.google.com/site/saumenguha1)।

লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার ফল (impact) হয়েছিল মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অনেক কর্মী বি.ও.বি.-র পাতায় সৌমেন গুহর লেখার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এমন হয়েছিল যে, সমালোচনা কখনো কখনো ব্যক্তি আক্রমণের পর্যায়েও চলে গিয়েছিল।

১৯৮৪-তে কোলকাতার বি.ও.বি. পত্রিকায় সৌমেন গুহর লেখা এবং তা নিয়ে সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার বত্রিশ বছর পর ২০১৬ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকারীদের একটি সম্মেলনে জন হরগ্যান নামে একজন বিজ্ঞান সাংবাদিক ও লেখক তাঁর বক্তৃতায় এবং পরে সেই বক্তৃতাভিত্তিক একটি লেখায় আমেরিকার কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেন। সেই প্রশ্ন তোলার ফলও হয়েছিল মৌচাকে ঢিল মারার মতোই।

কেন এই লেখা?

কী এমন প্রশ্ন তুলেছিলেন কোলকাতায় ১৯৮৪ সালে সৌমেন গুহ এবং আমেরিকায় ২০১৬ সালে জন হরগ্যান—যা নিয়ে এতো জলঘোলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ এবং আমেরিকার কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের আঙিনায়? গুহ এবং হরগ্যানের তোলা প্রশ্নর সাদৃশ্য এবং পার্থক্য কী কী? গুহর করা প্রশ্নগুলো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতিক্রিয়া এবং হরগ্যানের তোলা প্রশ্নগুলো নিয়ে আমেরিকার কুসংস্কারবিরোধীদের প্রতিক্রিয়ার কোনো মিল কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই মিল-অমিল খুঁজে পাওয়ার তাৎপর্যই বা কী? এসব নিয়েই আমার লেখা।

কোলকাতা ১৯৮৪ ঃ যে পথে বাধা ন্যূনতম

পশ্চিমবঙ্গের কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে গুহর প্রধান সমালোচনা ছিল, আন্দোলনকারীরা আক্রমণের

লক্ষ্যবস্তু হিসেবে যেসব কুসংস্কারকে বেছে নিচ্ছেন, সেগুলোর "বিরুদ্ধে কথা বলা অনেক সহজ, কম ঝুঁকি [পূর্ণ]"...। অর্থাৎ তাঁরা সে পথই বেছে নিচ্ছেন, যে পথে "বাধা ন্যূনতম"। উদাহরণ হিসেবে ন্যাবা বা জন্ডিসের মালা এবং নিউরোবায়ন (Neurobion) ইঞ্জেকশনের একটি তুলনামূলক আলোচনা ক'রে গুহ লিখেছেন, "তুলনা করলে দেখা যাবে—ন্যাবার [মালার] থেকে অনেক বৃহৎ প্রতারণা জড়িয়ে রয়েছে নিউরোবায়ন্ ওষুধটির সাথে। তবুও, ন্যাবার মালা প্রথমে আক্রান্ত হবে..."। গুহর প্রশ্ন, "দুর্বল (weak) ও শক্তিশালী (strong) প্রতারণা শ্রেণীবিভাগ ক'রে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন" হচ্ছে না কেন?

নিউ ইয়র্ক ২০১৬ ঃ নিরাপদ বনাম বিপজ্জনক নিশানা

এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে, ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে ওপরে আলোচিত যে সমালোচনা সৌমেন গুহ উত্থাপন করেছিলেন, ঠিক বত্রিশ বছর পর ২০১৬ সালে আমেরিকার কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের সমালোচনা হিসেবে খুব জোরালোভাবে সেই কথাই শোনা গেল জন হরগ্যানের বক্তৃতায় এবং লেখায়।

আমেরিকায় কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকারীরা 'সংশয়বাদী' বা 'স্কেপটিক' (skeptic) নামে পরিচিত। হরগ্যান শুরুতে তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম হিসেবে ঠিক করেছিলেন "সংশয়বাদী আন্দোলন ঃ নিরাপদ বনাম বিপজ্জনক নিশানা" (Skepticism ঃ Hard versus Soft Targets)। একবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার সংশয়বাদীদের উদ্দেশে হরগ্যান বলেছেন,

> "ঈশ্বরবিশ্বাস, ভূতপ্রেত, স্বর্গ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (extra-sensory perception), জ্যোতিষ, হোমিওপ্যাথি এবং ইয়েতির অস্তিত্ব—এসবে বিশ্বাস করাকে আপনারা তীব্রভাবে আক্রমণ ক'রে থাকেন। ...এইসব বিশ্বাস নিঃসন্দেহে সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু আমি যেটা বলি, তা হোলো এগুলি নেহাতই 'নিরাপদ, নিরীহ নিশানা' (Soft Targets)।"
>
> ..."অন্যদিকে যেসব বিশ্বাসকে আমি 'বিপজ্জনক নিশানা' (Hard Targets) বলে মনে করি, তাদের দিকে আপনারা নজর দিচ্ছেন না। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং নামকরা বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান যেসব সন্দেহজনক, এমনকি ক্ষতিকারক দাবিগুলি তুলছেন, আমার মতে সেগুলিই হোলো প্রকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষ (Hard Targets)।"

হরগ্যান বিপজ্জনক নিশানার (Hard Targets) বেশ কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

হরগ্যান লিখেছেন, "বিগত কয়েক দশক ধরে আমেরিকার সাইকিয়াট্রি বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলোর (Big Pharma) মার্কেটিং ব্রাঞ্চের রূপ পরিগ্রহ করেছে।"

বিহেভিয়ারাল জেনেটিক্স (Behavioural Genetics) থেকেও হরগ্যান বেশ কিছু বিপজ্জনক নিশানার (Hard Targets) উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "গত কয়েক দশক ধ'রে জিনবিজ্ঞানীরা (Geneticists) প্রায় সমস্ত শারীরিক-মানসিক বৈশিষ্ট্য (traits) বা উপসর্গের জন্য অমুক জিন বা তমুক জিন দায়ী—এরকম সব আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন।" 'গড জিন' (God gene), 'ওয়ারিঅর জিন' (warrior gene), 'লিবার‍্যাল জিন' (liberal gene), 'ইন্টেলিজেন্স জিন' (intelligence gene), 'ফিল-গুড জিন' (feel-good gene), 'ইনফিডেলিটি জিন' (infidelity gene)—এসব জিন আবিষ্কারের দাবি বিজ্ঞানীরা করেই চলেছেন। হরগ্যান জোর দিয়ে লিখেছেন; "এসব দাবির কোনোটাই কিন্তু আজ অবধি আদৌ প্রমাণিত হয়নি। হয়নি মানে কোনো ক্ষেত্রেই হয়নি।"

হরগ্যান আরো লিখেছেন, "যুদ্ধ নিয়ে কিছু জীববিজ্ঞানী একটা তত্ত্ব খাড়া করেছেন। সেটি হোলো 'যুদ্ধের আদিম শিকড়ের তত্ত্ব' (deep-roots theory of war)। আর এই তত্ত্বটি আমাকে রীতিমতো খেপিয়ে তোলে। এই তত্ত্ব দাবি করছে, আমাদের জিনের মধ্যেই নাকি লুকিয়ে আছে যুদ্ধের বাতিক। দলবেঁধে হত্যাকান্ড ঘটানোর (lethal group violence) প্রবণতা নাকি আমাদের জিনের নির্দেশ।" হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের সমর্থক।

অথচ, হরগ্যান লিখেছেন, "যুদ্ধ যে মানুষের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে সমাজের গর্ভে জন্ম নিয়েছে (war was a cultural innovation), তার সপক্ষে ভুরি ভুরি সাক্ষ্যপ্রমাণ (evidence) রয়েছে। বস্তুত, মানুষের সংস্কৃতির অঙ্গ

হিসেবে কৃষি, ধর্মবিশ্বাস, দাসপ্রথা এসবের মতো যুদ্ধও আবিষ্কৃত হয়েছিল খুব বেশি হলে বারো হাজার বছর আগে।"

হরগ্যানের মতে যুদ্ধের এই 'আদিম শিকড়ের তত্ত্ব' এবং যুদ্ধবাজ বিজ্ঞানীদের সক্রিয়তা "সত্যিকারের বিপজ্জনক নিশানা (Hard Target) এবং আক্রমণের যোগ্য।" অথচ আমেরিকার সংশয়বাদী আন্দোলনের বর্শামুখ যুদ্ধসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের দিকে কখনোই তাক করা হয় না।

এ প্রসঙ্গে হরগ্যান লিখেছেন, "বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা আমেরিকার মিলিটারিতন্ত্রের (US Militarism) বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। আইনস্টাইন, লাইনাস পাউলিং-এর মতো বিজ্ঞানীরা এবং সংশয়বাদী বিজ্ঞানী কার্ল সাগান সে অন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরীরা আজ কোথায়?"

সবশেষে সংশয়বাদীদের উদ্দেশে হরগ্যান পরামর্শ দিয়েছেন, "আপনারা হোমিওপ্যাথি এবং ইয়েতির অস্তিত্বের মতো নিরাপদ নিশানাকে (Soft Targets) আক্রমণ করার জন্যে কম সময় ব্যয় করুন—বরং বেশি সময় দিন বিভিন্ন বিপজ্জনক নিশানাকে (Hard Targets) আক্রমণের জন্যে।"

সৌমেন গুহ ঃ কিছু বাড়তি দেখা

জন হরগ্যানের সমালোচনা এমন একটা জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। কিন্তু সৌমেন গুহ এর পরেও আরো কিছু বলেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি গুহর প্রস্তাব ঃ লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলো প্রথমে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা দরকার। তারপর তা নিয়ে কথা বললে 'কুসংস্কার' বিরোধী আন্দোলন "সমৃদ্ধ হোতো"—"পায়ের তলায় শক্ত জমি পেতো।"

কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনকারীদের মানসিকতা নিয়ে গুহর সমালোচনা ঃ আন্দোলনকারীরা উচ্চমন্যতাবোধে আক্রান্ত। গুহ লিখেছেন, "এই উচ্চমন্যতাবোধ জনবিচ্ছিন্নতা শুধুই বাড়াবে।"

পশ্চিমবঙ্গের কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গুহ সবশেষে লিখেছেন, "ঠিক এটাই চলতে থাকলে, হয়তো কিছু দুর্বল কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর জনসাধারণকে শক্তিশালী কুসংস্কারের বলি হিসেবে তৈরী করে নেওয়া যাবে।"

লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলোকে এবং সেসবের শক্তির দিকটা বোঝার যে চেষ্টা আমরা সৌমেন গুহর লেখার মধ্যে পাই, তা কিন্তু জন হরগ্যানের লেখার মধ্যে নেই। এখানে বলা দরকার, গুহ আলোচনাটি করেছেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন পর্যবেক্ষক (participant observer) হিসেবে। অন্যদিকে হরগ্যান কথাগুলি বলেছেন আন্দোলনে অংশগ্রহণ না-করা একজন পর্যবেক্ষক (non-participant observer) হিসেবে।

একটি অভিযোগ ঃ প্রসঙ্গ 'ঠুঁটোমারি বাঁধ'

গুহর লেখাটিতে বহু সদর্থক ভাবনা থাকলেও 'ঠুঁটোমারি বাঁধ' প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন, তা আমাকে আহত করেছে। গুহ লিখেছেন ঃ

"1978 সালের ভয়াবহ বন্যায় আরামবাগ থানায় (হুগলী জেলা) গোঘাট ব্লকের 'ঠুঁটোমারি বাঁধ' দেখেছিলাম। এই ব্লকটা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। নিজের সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে এটা দেখেছিলাম—দ্বারকেশ্বরের পশ্চিম পারের এই বাঁধটা, পূর্ব পারের সরকারী দীর্ঘ বাঁধের থেকে ছিল প্রযুক্তিগত ভাবে অনেক বেশী সঠিক। সমস্ত গ্রাম্য মানুষের চেষ্টায় বাঁধটা তৈরি করে দীর্ঘ দিন দ্বারকেশ্বরকে ঠেকানো গিয়েছিল। অন্তত ঐ অঞ্চলে সরকারী 'বৈজ্ঞানিক' কাজ ছিলো বন্যায় মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির জন্যে অধিকাংশে দায়ী।

"তবু ঠুঁটোমারি বাঁধ একটি 'ঠুঁটো' বালককে বলি দিয়ে উদ্বোধন করার ঘটনাটা সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু বাঁধটা তৈরী হয়েছিলো—গ্রামীণ মানুষ আর মালমশলা মিশিয়ে একেবারে নিখুঁত। নরবলি ছিলো একটি গৌণ আচার মাত্র। ওই অঞ্চলে কোনো সরকারী কর্মকান্ড দেখি নি—'ঠুঁটোমারি বাঁধ' তৈরীর থেকে অধিকতর 'বৈজ্ঞানিক'।"

শক্তিশালী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত লেখক গ্রামীণ মানুষের কারিগরি দক্ষতার জয়গান গাইতে গিয়ে 'নরবলি'-র মতো নৃশংস প্রথাকে এখানে ছোট করে দেখছেন ("নরবলি ছিলো একটি গৌণ আচার মাত্র।")। ভিন্নভাবে সমর্থ (differently abled) বালকটির হত্যার ঘটনাটি গুহ

যেভাবে লিখেছেন, তা কেবল উল্লেখমাত্র হয়েই রয়ে গিয়েছে—প্রতিবাদ হয়ে ওঠেনি। বাঁধ তৈরির ব্যাপারে গ্রামীণ মানুষের কারিগরি জ্ঞানের দিকটি তিনি যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন, একই লোকসমাজে বাঁধ তৈরির সময় প্রচলিত 'নরবলি' নামক গভীর বেদনাদায়ক এবং ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাসটির বিরুদ্ধে তিনি ততটা সরব নন।

সৌমেন গুহর লেখার প্রতিক্রিয়া

আগেই বলেছি, বি.ও.বি.-তে সৌমেন গুহর লেখাটি প্রকাশের ফল হয়েছিল মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো। পর পর দু'টো সংখ্যায় (জুলাই-অক্টোবর ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৯-১৭ এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১০-১২) বি.ও.বি.-তে লেখাটি নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। (পুরো বিতর্কটি 'বিজ্ঞান, মানুষ ও সমাজ' নামে একটি ই-বুকেও সম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে—URL: https://sites.google.com/site/saumenguha 1)। গুহর লেখার শব্দসংখ্যা ছিল প্রায় ২,২৫০। মূলত সেই লেখা নিয়ে প্রকাশিত পাঠকের মতামতের শব্দসংখ্যা ছিল প্রায় ৫,৪৮০। মোট ১৪ জন পাঠকের মতামত ছাপা হয়।

গুহর লেখা নিয়ে বি.ও.বি.-র বিতর্কমঞ্চে রণজিৎ ঘোষ লিখেছিলেন ঃ

> "এই আন্দোলন করে আমরা হয়তো অনেক কিছুই করতে পারছি না, অনেক ঘাটতিও আছে। কিন্তু সদিচ্ছা, প্রচেষ্টার খামতি নেই, তাই না পারার জ্বালাটা খুব বেশী। এই লেখা[টিতে] আমি সেই জ্বালাটা খুঁজে পাইনি। সমালোচনা ঋণাত্মক হলেও সেই জ্বালাবোধটাই তার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক। কিন্তু লেখা [টিকে] কেমন একটা নিস্পৃহ, বিচ্ছিন্ন মানুষের ছুঁড়ে দেওয়া কিছু মন্তব্যের মতো মনে হয়।"

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রায় ১,৭৬৩ শব্দসংখ্যার দীর্ঘ চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

> ..."রচনার বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার ইচ্ছাকে নিবারণ করতে পারলাম না কারণ 'বি.ও.বি'-র মত কমিটেড পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে বুদ্ধিদীপ্ত আঙ্গিকে বিভ্রান্তিকর চিন্তার প্রকাশ রীতিমত ক্ষতিকারক ব'লে মনে হল। সুস্থ বিতর্ক সর্বদাই কাম্য। কিন্তু শুধুই বিতর্কের জন্য বিতর্ক উত্থাপনে কোন সুস্থতা নেই। ইদানীং যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আলোচনা ও আন্দোলন (যার অন্যতম একটি দিক হল কুসংস্কার বিরোধিতা) পায়ের তলায় শক্ত জমি পাচ্ছে তখন 'বি.ও.বি.'র ওই বিতর্কিত [নিবন্ধ] বিজ্ঞানচেতনা বিকাশের উষা-আলোকিত পথে বিভ্রান্তির আবর্ত সৃষ্টি করছে বলে মনে করছি।
>
> ..."সৌমেন গুহর লেখাটির অধিকাংশ বক্তব্যেরই আমি বিরোধী।
>
> ..."আসলে লোকবিশ্বাস আর লোকসংস্কৃতির প্রতি [লেখকের] অন্ধপ্রীতি কুসংস্কারের স্বকীয় চরিত্রটিকে বুঝে উঠতে দেয়নি।
>
> ..."ন্যাবার মালার সমস্যা নিয়ে যত সঠিকভাবে সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করা যাবে, নিউরোবিয়ন বা মাল্‌টিন্যাশনাল সমস্যা নিয়ে এখনই তা করা যাবে না। প্রশ্নটা অগ্রাধিকারের। হ্যাঁ, রাস্তাটা সহজ মনে হয় কিন্তু কাজটা সর্বদা সহজ হয় না; তাছাড়া সহজ পথেই তো প্রথমে এগোতে হবে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের মৌলিক নীতিতেও তাই বলে।...
>
> ..."শেষে সৌমেনবাবুর "একটি সম্ভাবনা" কলামে ঘোষিত প্রস্তাবে অসহিষ্ণু না হয়ে পারলাম না।...বাস্তব অবস্থার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ালে সব বক্তব্যই বায়বীয় হয়ে দাঁড়ায়। "নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা" ছোট ছোট সংগঠনগুলি করছে, প্রাথমিক কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে তারা কুসংস্কার বিরোধিতাকে বেছে নিয়েছে। এদের প্রয়াসকে আরো নির্দিষ্ট প্রয়োগমূলক সহযোগিতা দিয়ে শক্তিশালী করতে পারলে করুন, না পারলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ঠিক নয়।"

চিত্ত সামন্ত তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

> ..."বাধা বা ঝুঁকি অনুসারে (কোন্ সূচকে মাপা হবে?) আন্দোলনের শ্রেণীবিভাগ (Weak, Moderate, Strong, Very Strong ইত্যাদি) করার চেষ্টা অর্থহীন, অবাস্তব প্রস্তাব। ...বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলে 'কুলীন

বিপ্লবী' হওয়া যায় কিন্তু ন্যাবার মালার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে পারলে কাজের কাজ কিছুটা অন্তত হয়। 'জাতে ওঠার' তাগিদে কর্মসূচী ঠিক করাটা হঠকারিতা। এই ধরনের প্রস্তাব লেখকের কর্মবিচ্ছিন্নতা (অথবা বিমুখতা) প্রমাণ করে।

"বিজ্ঞানকর্মীদের উচ্চমন্যতাবোধ সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সাধারণ চিত্র নয়। বরং শুধুই সমালোচনা করার জন্য কিছু গালভরা পরিভাষা ব্যবহার করে লেখক সেই বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

..."এ সবই এসেছে একটি স্বাভাবিক ধারা মেনে—জাতে ওঠার তাগিদে নয়। শ্রী গুহ সম্ভবত এগুলির খবর রাখেন না। অর্থাৎ বোঝা যায় যে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাই ভুল চিত্র তুলে ধরেছেন। আর যদি তা না হয় তবে বুঝতে হবে যে তিনি সব জেনে শুনেও কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছেন। কোনটা ঠিক?

..."বিতর্ক অকাম্য নয়, কিন্তু কাজের বদলে শুধু বিতর্কই কি কাম্য? এই বিতর্কে হয়ত অনেকেই অংশ নেবেন, কথার ফুলঝুরি ছুটবে, কে কত পড়েছে তা জানা যাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি বা সংগঠন নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের সুযোগ ও সুবিধেমত সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানসচেতন করে তোলার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ কাজের কাজ করছেন, তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁরা বিভ্রান্ত হবেন, নিরুৎসাহিত হবেন—এটা নিশ্চয়ই আপনাদের আদর্শ নয়। অথচ তাঁদের আপনারা নিউরোবিয়ন বিরোধী আন্দোলনেও উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন না। লাভটা কার হল?"

সৃজন সেন তাঁর সমালোচনায় লিখেছিলেন ঃ

"কুসংস্কার বিরোধিতায় সৌমেন গুহর চিন্তা কতটা বৈজ্ঞানিক?

..."কোনো সমাজ সচেতন মানুষই সামাজিক কুসংস্করকে টিকিয়ে রাখার স্বপক্ষে কাজ করে না, কুসংস্কারের গুণগান করে না।

..."কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে "কম ঝুঁকি, বাধা ন্যূনতম", একথা বলার কোন যুক্তি নেই।"

..."আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাজনিত কুফল আর তার ব্যবহারকারীদের দ্বারা সৃষ্ট মুনাফাসৃষ্টিকারীদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই এখনো থাকবে, তবে সেটা এখনই মুখ্য স্থান অধিকার করতে পারে না। সৌমেনবাবুর মূল ভ্রান্তি এখানেই।"

সৌমেন গুহর "মূল ভ্রান্তি" চিহ্নিত ক'রেই সৃজন সেন থামেননি।

"আন্দোলনের বিজ্ঞান" ঠিক কী, তাও সেন মহাশয় পাঠকদের জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ

..."সুতরাং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের বর্তমান সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলা ও মানুষকে বিজ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল করার কাজে আমাদের উদ্যমকে নিযুক্ত করাই হোক আমাদের কর্মসূচী, সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি নয়।...কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানোর ক্ষেত্রে আমরা কোনো ক্ষেত্রেই আপোস করবো না। কিন্তু সক্রিয় আন্দোলন করার সময় আমরা বাস্তব অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করে যাবো না—এটাই আন্দোলনের বিজ্ঞান।"

ভবানীপ্রসাদ সাহু তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

..."দুঃখের বিষয় গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের সহযোগী অধিকাংশ সংগঠনগুলি, উৎস মানুষ বা এ ধরনের দু'চারটি বই পত্রিকাগুলির প্রায় সব কটিই কম বেশি কুসংস্কারের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি যে গুরুত্ব দেয় তা লেখকের [সৌমেন গুহর] জানা থাকার কথা হলেও এই ইতিবাচক দিকটিকে না তুলে বরং তাতে ঘুরিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হলো।

..."বি.ও.বি-র আলোচ্য [লেখায়]...নানা দিক থেকেই রয়েছে স্ববিরোধিতা, বিভ্রান্তি ও ক্ষতিকর চিন্তাগুলি।"

দীপঙ্কর দত্ত তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

..."এ ধরনের লেখা খুব ক্ষতিকারক। কারণ বিভ্রান্তিকর। মেঘ দূর করে না—ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' বিজ্ঞান আন্দোলনের বাহক হোক—দয়া করে বুদ্ধির টিয়ারগ্যাস ছুড়বেন না।"

মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন ঃ

..."সৌমেনবাবুর লেখাটা পড়ে 'কুসংস্কার' বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন না স্বপক্ষে বলছেন তা বোঝা গেল না।"

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

..."লৌকিক কুসংস্কারের তুলনায় 'বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের' শোষণ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা বেশী, শ্রী গুহের এই বক্তব্যে সত্যের অনেকটাই আছে।

..."সমাজের শ্রমজীবী জনসাধারণের সংস্কৃতিতে পরশ্রমজীবী বিজ্ঞান-শিক্ষিত লোকেরা কুসংস্কার খুঁজতে বেরুলে সৌমেনবাবু যদি বিরক্ত হন তাতে আমি তাঁর দলে।

..."শ্রী গুহের পাতি কুসংস্কারের 'ডিফেন্স' স্থিতাবস্থা বজায় ও বিজ্ঞান বিরোধিতার কাজেই অপব্যবহৃত হতে পারে, তা শ্রীগুহ চান বা না চান।"

অনীশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেনঃ

..."সৌমেনবাবু যা বলতে চান তা ঠিক, তবে এ রাস্তায় না গিয়ে বরং অনেক বেশী কাজ দেবে যদি তিনি এক নম্বর এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে করার মতো কিছু বিজ্ঞানী হিসেবে করতে পারেন। অন্ততঃ বিজ্ঞানী হিসেবে সত্য উদঘাটন করতে পারেন।"

উন্মনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেনঃ

..."গণ-আন্দোলনকে দিশেহারা করে দেবার জন্য "উৎস মানুষ বিরোধী বিশেষ সংখ্যা"টি প্রকাশ না করলেই সম্ভবতঃ ভাল হত। বিতর্ক ভালো কিন্তু অপবিজ্ঞান-অপসংস্কৃতিকে উঁচুতে তুলে ধরে অপব্যাখ্যার বন্যা বইয়ে দিয়ে যে বিতর্ক তা মোটেই সুস্থ চেতনার পরিচায়ক নয়...।"

সৌমেন গুহর লেখা নিয়ে বি.ও.বি.-তে প্রকাশিত শেষ চিঠির লেখক সিদ্ধার্থ লাহিড়ী। লাহিড়ী লিখেছিলেন:

..."নতুন দৃষ্টিকোণ খোঁজার নামে জনতার অবৈজ্ঞানিক সংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার মুখাপেক্ষী হওয়া লেজুড়বাদী মনোভাবেরই পরিচয়।

"বি-ও-বির অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিই এ ধরনের বিকৃত সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী বলে আমার বিশ্বাস।

..."কেন এই সংকীর্ণতা? কেন এমন কুসংস্কার-দুষ্ট কথাবার্তা?"

এইসব চিঠি ছাড়া লেখাটি নিয়ে অরূপশঙ্কর মৈত্র এবং রঞ্জন ভদ্রদের দু'টি চিঠিও বি.ও.বি.-তে ছাপা হয়েছিল। এই দু'টি চিঠির বক্তব্য সৌমেন গুহর চিন্তার অনুসারী ছিল।

এতগুলি তীব্র সমালোচনামূলক চিঠি বি.ও.বি.তে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও—কেন জানি না—আত্মপক্ষ সমর্থনে সৌমেন গুহর কোনো বক্তব্য কিন্তু পত্রিকাটিতে ছাপা হয়নি।

জন হরগ্যানের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া

সৌমেন গুহর লেখা প্রকাশের প্রতিক্রিয়া (impact) নিয়ে আলোচনার পর এবার আসা যাক জন হরগ্যানের বক্তৃতা নিয়ে কী হোলো, সে প্রসঙ্গে। হরগ্যান একজন আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত 'নর্থইস্ট কনফারেন্স অন সাইন্স অ্যাণ্ড স্কেপটিসিজিম'-এ—২০১৬ সালের ১৫ই মে। এ ধরনের যে কোনো কনফারেন্সে—অন্তত আমেরিকায়—বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব—যেখানে শ্রোতারা বক্তাকে বক্তৃতার নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন করেন। কিন্তু হরগ্যানের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সভা-পরিচালক উদ্যোক্তা হরগ্যানকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেননি। বস্তুত, প্রশ্নোত্তর পর্বটাকেই তাৎক্ষণিকভাবে ছেঁটে দেওয়া হোলো। বক্তৃতার শেষে হরগ্যানকে পত্রপাঠ মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোলো। বক্তৃতার ফল হিসেবে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে অসৌজন্য প্রকাশের এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। হরগ্যান যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন, তখন সভা-পরিচালক মঞ্চে দাঁড়িয়ে একতরফাভাবে হরগ্যানের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করলেন। তিনি একটানা দশ মিনিট ধরে এই সমালোচনা চালিয়ে গেলেন।

বক্তৃতার পরদিন অর্থাৎ ১৬ই মে ২০১৬ হরগ্যান তাঁর বক্তৃতাটি একটি লেখা হিসেবে তার ব্লগ-এ প্রকাশ করেন (URL:https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/dear-skeptics-bash-homeopathy-and-bigfoot-less-mammograms-and-war-more/)।

এরপর শুরু হোলো আসল মজা। সমালোচনার ঢেউ (ঢিল?) আছড়ে পড়তে লাগলো। আমার মনে হয়েছে, সৌমেন গুহর লেখার প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মধ্যে তবু কিছুটা আড়াল আবডাল ছিল। কিন্তু বত্রিশ বছর পর আমেরিকাতে জন হরগ্যানের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়াগুলিকে স্বচ্ছন্দে খেউড় বলা যেতে পারে।

একটা উদাহরণ শুনুন। "Scathing Atheist" ছদ্মনামে একজন স্কেপটিক জন হরগ্যানকে "বোকাগাধা" (jackass)—"ভুল-তথ্য-জানা (misinformed) বালখিল্য (childish)"—বলেই ক্ষান্ত হননি। এমনকি "স্কুলস্তরের গোঁয়ারগোবিন্দ কুস্তিশিক্ষকে"র সঙ্গেও তুলনা করেছেন। ["...a misinformed childish jackass that looks like a high school wrestling coach that's been warned multiple times about long hugs."]

অন্য একজন তাঁর নিন্দাবাদে বলেছেন, "এমন একটি নির্বোধ লেখা দীর্ঘকাল আমার চোখে পড়েনি।" তিনি আরো বলেছেন, "বামপন্থী পাগলদের (psychotic Left-ists) মতো হরগ্যান, আপনিও বলতে শুরু করেছেন যে, আমেরিকা হোলো বিশ্বশান্তির পথে প্রধান শঙ্কা। অথচ আমেরিকা এতোটাই উদার যে আপনার এই ধরনের পাগলামি বরদাস্ত করছে।"

আমেরিকার কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের দাপুটে ব্যক্তিত্ব মাইকেল শার্মার (Shermer) হরগ্যানের নিন্দা করতে গিয়ে তাঁকে "বিউটি কনটেস্টের লীলায়িত বিজয়িনীর" সঙ্গে তুলনা করেছেন। "বিজয়িনী [হরগ্যান] যেন সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বশান্তি নিয়ে তাঁর ফ্যান্টাসির কথা সবাইকে শোনাচ্ছেন।"

'স্কেপটিক্যাল সাইন্স' পত্রিকায় ডেভ (Dave) শব্দের ফুলঝুড়ি ব্যবহার ক'রে হরগ্যানের বক্তব্যকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "Skep-tics have been expressing skepticism regarding his [Horgans's] skepticism of the skeptics."

গুটিককে মানুষ অবশ্য হরগ্যানকে সমর্থন করেছেন।

সৌমেন গুহ এবং জন হরগ্যান—দু'জনকেই যেভাবে সমালোচনার ঝড় সহ্য করতে হয়েছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁদের বক্তব্য অভিঘাত (impact) তৈরির মতো যথেষ্ট ওজন বহন করছিল।

যাঁরা দাবি করেন "সব কিছুতেই খুঁজবো কারণ, অন্ধভাবে মানবো না। বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায় বন্দী ক'রে রাখবো না।"—তাঁদের অন্যতম মূল ভাবনা, আমরা আশা করবো, সমালোচনাকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন। সমালোচকের তোলা প্রশ্নগুলি নিয়ে তাঁরা যুক্তিনিষ্ঠ চর্চা এবং আলোচনা করবেন। এবং সমালোচনার সংঘাতবিন্দু থেকে সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখছি—কী পশ্চিমবঙ্গে, কী আমেরিকায়—তাঁরা তা করছেন না। সমালোচককে তাঁরা যুক্তিহীনভাবে আক্রমণ করছেন, সে আক্রমণে প্রায়ই তাঁরা রুচিহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন, এমনকি বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতাদের সঙ্গে কোনো আলোচনার সুযোগ পর্যন্ত দিচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গ এবং আমেরিকা—দু'জায়গাতেই একই ছবি।

বিতর্কসভায় অংশগ্রহণকারীরা একবগ্গাভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন এবং বিরোধী পক্ষের ত্রুটি প্রমাণের জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করেন। "সত্য" কে **প্রতিষ্ঠা** করার ঝোঁক সেখানে **স্পষ্ট** —সত্যকে **জানাব**, সত্যকে **আবিষ্কারের** প্রচেষ্টা সেখানে আমরা এমনকি আশাও করি না।

যুক্তির এই ধারা কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে চলে না। কুসংস্কারবিরোধী বিজ্ঞান আন্দোলনকারীরাও সত্যকে জানার চেষ্টা করবেন এবং সেই অনুযায়ী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করবেন—এটাই আমরা আশা করবো। তা না ক'রে তাঁরা যদি আত্মপক্ষ সমর্থনে মরীয়া হয়ে সমালোচককে বিরোধী পক্ষ ধ'রে নিয়ে আক্রমণ এবং হেনস্থার পথে হাঁটেন, আমরা অবশ্যই বলবো, কুসংস্কারবিরোধী বিজ্ঞান আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়েছে।

যে আন্দোলনের কর্মীরা প্রশ্নমনস্কতাকে উৎসাহিত করেন, তাঁরা নিজেরা যখন অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হন, তখন তাদের আচরণে যে অসহিষ্ণুতার প্রকাশ আমরা পশ্চিমবঙ্গ এবং আমেরিকায় দেখলাম, তা খুবই বেদনাদায়ক।

এই লেখায় আমরা দেখলাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং আমেরিকা—এই দু'জায়গাতেই দুই সমালোচক অভিযোগ তুলেছেন, কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকারীরা বিপজ্জনক নিশানার (Hard Targets) বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথে হেঁটে ক্ষমতাধরদের চটাতে চাইছেন না। কোনো ঝুঁকি নিচ্ছেন না। যে পথে বাধা ন্যূনতম (path of least resistance), সেটাই বেছে নিয়েছেন। তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হইচই ক'রে বাজার মাত করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও আমেরিকার কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাদৃশ্য শুধু আন্দোলনের নিশানা হিসেবে নিরাপদ, নিরীহ বিষয়কে (Soft Targets) বেছে নেওয়াতেই আটকে নেই। এই দু'জায়গাতেই আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার বা সমালোচনার প্রতিক্রিয়া (impact) হিসেবে আন্দোলনকারীদের আচরণেও মিল লক্ষ্য করার মতো। মিলটা হোলো সমালোচনার প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা।

বত্রিশ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই দেশের কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের চরিত্রের এই মিল খুঁজে পাওয়ার তাৎপর্য কী? এই দুই জায়গাতেই আন্দোলনকারী মানুষজনের মধ্যে একই ধরনের মানসিক প্রবণতাই কি এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল? স্বমতপ্রিয়তা, ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, সহজেই কাজ হাসিল ক'রে ফেলার চেষ্টা—এরকম কিছু মানসিক প্রবণতাই কি দেশকাল নিরপেক্ষভাবে একই ধরনের আচরণের জন্ম দেয়? এজন্যেই কি অনেক সময় বলা হয়, সদর্থক সামাজিক কাজ করতে চাওয়াটাই যথেষ্ট নয়—তার জন্যে নিজেকেও যোগ্য হয়ে উঠতে হয়? এর অর্থ কি এই যে, সমস্যা কেবল বাইরে বা সমাজেই নয়—সমস্যা লুকিয়ে রয়েছে আমাদের মনের ভেতরেও? তা যদি হয়, যাঁরা সদর্থক সামাজিক কাজ করতে চাইছেন, তাঁদেরকে নিজেদের মনের ভিতরকার এই সমস্যাগুলিকে, মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা শত্রুকে (the enemy within) চিনতে হবে, তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হবে এবং তাকে অতিক্রম করার সচেতন প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। এটাও একটা ভাববার বিষয় যে আত্মবীক্ষণের অভাব ও বিরূপ সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণুতা কি শুধু কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনেরই সমস্যা? অন্যান্য সদর্থক সামাজিক আন্দোলন যখন পথভ্রষ্ট হয় কিংবা গতি হারিয়ে ফেলে, তখন অন্য নানা কারণের সাথে তার পেছনেও কি খুঁজে পাওয়া যাবে এই দুটি দুর্বলতাও?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: লেখাটি তৈরি করতে আমার শিক্ষক অঞ্জন মজুমদার এবং আমার বন্ধু বলাইয়ের (সুমিত চক্রবর্তী) সঙ্গে বার বার দীর্ঘ আলোচনা খুব সাহায্য করেছে।

ভিন্ন স্বাদের কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

● নিউক্লিয়ার বোমা নয় ● রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা
● মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা ● পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ ● পরিবেশ আইন-কানুন ● হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান ● বিজ্ঞান সমাজ মানুষ ● পরিবেশবিদ্যা পরিচয় ● পরমানু শক্তি নয়-বিকল্প শক্তিই ভরসা ● ভারতের আম আদমির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ● বিজ্ঞানে আন্দোলন অথবা কূপমণ্ডুক্তার চর্চা
আচর্য প্রফুল্লচন্দ্র : স্মরণ ও নির্মাণ : রবীন মজুমদার

পাওয়া যাবে দু'হাজার উনিশের বইমেলায় বি-ও-বির টেবিলে ও অন্যত্র।
বি-ও-বি-তে আপনার মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য
ডাকযোগে এবং / অথবা ব্যাক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।
প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা, 2/1A,আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-700009

দশ বছর ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে
দুর্বার ভাবনা

12/5 নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা- 700006 ফোন : 033-25437560/7451
ই-মেল: tarunbasu2006@gmail.com,URL :www.durbar.org

প্রিয় সংশয়বাদী, আপনারা কম আক্রমণ করুন হোমিওপ্যাথিকে অথবা ইয়েতিকে, বরং তুলোধোনা করুন ম্যামোগ্রাম আর যুদ্ধকে

মূল রচনা : জন হরগ্যান
অনুবাদ : অঞ্জন মজুমদার

সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত আচার বিশ্বাস নিয়ে কড়া সমালোচনা করে থাকেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু মানুষ। তাঁরা সে দেশে SKEPTIC সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই SKEPTIC সম্প্রদায়ের আক্রমণের লক্ষ্য (target) অর্থাৎ বিষয়বস্তু নিয়েই এবার সমালোচনায় নেমেছেন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞান সাংবাদিক জন হরগ্যান। হরগ্যানের বিবেচনায় target-দের মধ্যেও বিভাজন দরকার। তাঁর মতে কিছু target রয়েছে, যেগুলি soft প্রকৃতির। আর কিছু রয়েছে hard target। হরগ্যানের অভিযোগ—আমেরিকার SKEPTIC সম্প্রদায় soft target -দের নিয়েই ব্যস্ত। সেখানে তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ hard target-গুলি তাঁদের আলোচনাতে স্থান পায়না। হরগ্যানের আহ্বান—target নির্বাচনের ক্ষেত্রটি SKEPTIC-রা যেন নতুন করে ভেবে দেখেন এবং soft target-এর তুলনায় hard target-গুলিকে বেশি আক্রমণ করেন।

২০১৬ সালের ১২ থেকে ১৫ই মে নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো "সেলিব্রেশন অফ সায়েন্স, অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং", যার কেতাবী নাম হলো, এন ই সি এস এস, (NECSS) অর্থাৎ নর্থ ইস্ট কনফারেন্স অন সায়েন্স অ্যান্ড স্কেপটিসিজম। সেখানে গতকাল আমি বক্তৃতা দিয়ে এলাম। দার্শনিক ম্যাসিমো পিগ্লিউচ্চির সঙ্গে ক'দিন আগেই আমার দেখা হয়েছিলো। তখন তিনিই আমাকে আমন্ত্রণটা জানিয়েছিলেন। তিনি তার জন্য এখন নিশ্চয়ই আফসোস করছেন। কারণ প্রথম থেকেই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমার বক্তৃতায় আমি স্কেপটিক (Skeptic) অর্থাৎ সংশয়বাদী মানুষদের সমালোচনা করবো—একেবারে তুলোধোনা করে ছাড়বো। প্রথমে ভেবেছিলাম আমার বক্তৃতার শিরোনাম হবে "সংশয়বাদী আন্দোলনঃ নিরীহ বনাম বিপজ্জনক নিশানা" ("Skepticism ঃ Hard Versus Soft Targets")। পরে শিরোনামে "বিগফুট" অর্থাৎ "ইয়েতি" ইত্যাদি শব্দগুলি যোগ করি। স্টেজে ওঠার ঠিক আগে অনুষ্ঠানের সংযোজক জেমি আয়ান সুইসের সাথে আমি যখন কথা বলছিলাম, তখনই শব্দটি আমার মাথায় আসে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু কি ধরনের। আমি উত্তর দিতে না দিতে নিজেই ইয়েতির ব্যাপারে তাঁর প্রবল অবিশ্বাসের কথা রীতিমতো আগ্রাসী ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন তিনি। তিনি কিন্তু মোটেই হাল্কা ভাবে কথাগুলি বলেননি। এদিকে আমার বক্তৃতার পরিকল্পনায় ইয়েতি (Bigfoot) আদৌ ছিল না। আমি সেই মুহূর্তেই ঠিক করে ফেললাম যে, সুইসের সাথে আলোচনার বিষয়টি আমি আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করবো। সুইসও তার প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। বক্তৃতার শেষে যে প্রশ্নোত্তরের পর্বটি ছিল, সেটা পুরোপুরি ছেঁটে দিলেন। আমিও শ্রোতাদের কথা দিয়ে এলাম যে, আমার বক্তৃতাটি আমি পোস্ট করে দেব এবং সে সম্পর্কে সবার সমালোচনা এবং ইমেলের জবাবও দেবো।

যারা নতুন কোনো ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাদের কাছে পুরনো ধর্ম বিষয়ে প্রচারকে আমি ঘৃণা করি। আপনি যদি বুদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে থাকেন, আমি তখন বুদ্ধধর্মকে কঠোর সমালোচনা করবো। আপনি যদি স্কেপটিকদের দলের কেউ হয়ে থাকেন, আমার কাজ হবে স্কেপটিসিজমকেই আক্রমণ করা। একজন বিজ্ঞান সাংবাদিক হয়ে আমি মোটেই বিজ্ঞানের ভজনা করি না। বরঞ্চ, তার সমালোচনা করাটাই আমার লক্ষ্য—কারণ আমি এটাই বুঝি যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য চিয়ারলিডারদের চাইতে আজকে বেশি প্রয়োজন সমালোচকদের। 'প্রকৃত বাস্তবতা' (reality)-র পাশাপাশি 'বিজ্ঞান নিয়ে অতিরিক্ত উল্লাস' (scientific hype)—এদের মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে—সেটাই আমি দেখাতে চেষ্টা করি। এসব নিয়েই আমাকে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে হয়, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক দাবীই—অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের রিভিউতে প্রশংসিত (peer reviewed) হলেও—আদতে রীতিমতো ভুলে ভরা।

সেদিক থেকে দেখলে আমিও অবশ্য স্কেপটিকদের মধ্যেই পড়ে যাচ্ছি। তবে এক্ষেত্রে তফাৎ শুধু একটাই, আর সেটা হলো আমার স্কেপটিক (skeptic) বানানের মধ্যে 'এস' অক্ষরটাকে ছোট হাতের ধরতে হবে। আমি কোনো স্কেপটিক (Skeptic) সংগঠনের সাথে যুক্ত নই। অথবা নিজেদেরকে যারা বড়ো হাতের 'এস' স্কেপটিক বা নাস্তিক অথবা যুক্তিবাদী বলে দাবী করে—আমি তাদের সাথেও কোনোভাবে যুক্ত নই। এই ধরনের কয়েকজন মানুষ একসাথে জড়ো হলেই তাঁরা কেমন যেন আদিবাসী গোছের হয়ে যান। একে অন্যের পিঠ চাপড়াতে থাকেন আর বলতে থাকেন যে নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে অন্যান্য সব গোষ্ঠীর তুলনায় তাঁরা কত বেশি প্রগতিশীল।

বড়ো হাতের 'এস'-যুক্ত স্কেপটিসিজম-এর প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ দুজন মানুষের উদাহরণ দেখা যাক। এদের মধ্যে একজন হলেন জীব বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স, আর অন্যজন হচ্ছেন পদার্থবিদ লরেন্স ক্রস। ক্রস অল্পদিন আগে একটা বই লিখেছেন যার নাম হচ্ছে 'এ ইউনিভারস ফ্রম নাথিং'। মহাবিশ্বে কোনও কিছুর অস্তিত্ব না থাকার তুলনায় কিছু বস্তুর অস্তিত্ব থাকার কারণটা ঠিক কী—সেই প্রাচীন প্রশ্নটির সমাধান পদার্থবিদ্যার মধ্যে আছে বলে তিনি দাবী করছেন। ক্রসের লেখার মধ্যে বইটির শিরোনামের প্রতি কোনো সুবিচার করা হয়েছে বলে আমার একেবারেই মনে হয়নি। অথচ, ডকিন্স লেখাটি পছন্দ করেছিলেন। বইটির পরিশিষ্ট অংশে তিনি লিখেছেন—'অন দি অরিজিন অফ স্পিসিজ' বইটি সুপার ন্যাচারালিজম্-কে ধ্বংস করার কাজে যদি, জীববিদ্যার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র বলা হয় তাহলে 'এ ইউনিভারস ফ্রম নাথিং' বইটিকে কসমোলজি-র অন্তিম ঘণ্টা বলা যেতে পারে। ডকিন্স যে চার্লস ডারউইনের সঙ্গে লরেন্স ক্রসের তুলনা করতে চেয়েছেন তা বেশ স্পষ্ট। এমন একটা বোকার মতো কথা ডকিন্স কেমন করে বলে ফেললেন? আমরা আগেই জানতাম যে, রিলিজিয়ন বিষয়টির প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা—আর সেই সূত্র ধরেই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তিনি গোলমাল করে ফেলেন। 'বিজ্ঞানের বিভ্রম' (The Science Delusion) বলতে যা বোঝায় তিনি তেমনই একটা কিছুতে আচ্ছন্ন হয়েছেন বলেই মনে হয়। বড়ো হাতের 'এস'-যুক্ত স্কেপটিক-দের মধ্যে এই 'বিজ্ঞানের বিভ্রম' প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাঁরা তাঁদের স্কেপটিসিজম-কে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করেন না। ঈশ্বর-বিশ্বাস, ভূতপ্রেত, স্বর্গ, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, জ্যোতিষ, হোমিওপ্যাথি, অথবা ইয়েতি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা অতিরিক্ত বেশি স্কেপটিক। এনারা তাদেরকেও প্রবলভাবে আক্রমণ করেন, যারা জি এম খাদ্যশস্য, টাকাকরণ, ভূ-উষ্ণায়ণ ইত্যাদিতে অবিশ্বাস করে। এসব বিশ্বাস অবিশ্বাস নিঃসন্দেহে সমালোচনার বিষয়, কিন্তু এগুলি বস্তুতঃ নিতান্তই লঘু বিষয় (soft targets)।

একথা বলার কারণটা এই যে, এসব ক্ষেত্রে আক্রমণগুলি বেশিরভাগই করা হচ্ছে নিজের গোষ্ঠীর বাইরে। আর মজার কথাটা হল এই যে, অন্য গোষ্ঠীর মানুষ এ গোষ্ঠীর মানুষের কথায় কোনো পাত্তাই দেয়না। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সেই ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকেই উপদেশ

দেওয়া হচ্ছে। আর এর ফলটা হলো এই যে, আসল ভারি প্রতিপক্ষ যারা তারাই ছাড় পেয়ে গেল। অন্যদিকে যে সব বিশ্বাসকে আমি বিপজ্জনক বলে মনে করি (hard targets), তাদের দিকে আপনারা নজর দিচ্ছেন না। বড় মাপের অনেক বিজ্ঞানী এবং নামকরা বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান যেসব সন্দেহজনক—এমনকি ক্ষতিকারক দাবীগুলি তুলছেন, আমার মতে সেগুলিই হলো প্রকৃত কঠিন প্রতিপক্ষ (hard targets)। এমনই কিছু ভারি প্রতিপক্ষ নিয়ে এখন আমি আলোচনা করবো। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ আলোচনায় আসবে। একদম শেষে কথা বলবো যুদ্ধকে নিয়ে—যা আমাদের কঠিনতম প্রতিপক্ষ। আর তখনই বলবো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নানান বাতেলাবাজির কাহিনী।

বহুবিশ্ব তত্ত্ব এবং অনন্যতার ধারণা (Multiverses and Singularity)

প্রথমে পদার্থবিদ্যার কথাই ধরা যাক। বিগত কয়েক দশক ধরে স্টিফেন হকিং, ব্রায়ান গ্রীন এবং লিওনার্দো সাসকিনড প্রমুখ পদার্থবিদগণ বাস্তবতার চূড়ান্ত বর্ণনা হিসেবে বহুবিশ্ব তত্ত্ব এবং স্ট্রিং থিয়োরির পক্ষে দরবার করে চলেছেন।

এখন সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, বহুবিশ্ব তত্ত্ব আর স্ট্রিং থিয়োরি তো আর হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখানো যাচ্ছে না। আর তা ছাড়া তত্ত্বগুলিকে falsify বা মিথ্যে প্রমাণ করবারও কোনো সুযোগ নেই। কাজেকাজেই একে জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা ফ্রয়েডিয় মনোবিদ্যার মতোই এক অপবিজ্ঞান (Pseudoscience) হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। বহুবিশ্ব তত্ত্ব আর স্ট্রিং থিয়োরিকে যারা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন—তাঁদের একজন হলেন শন ক্যারল। বিপদে পড়ে তিনি এখন বলছেন যে, বিজ্ঞান—অপবিজ্ঞান চিনতে falsifiability শর্তটিকে তুলে দিতে হবে। খেলাতে আপনি হেরে যাচ্ছেন দেখে খেলার নিয়মটাই এখন পাল্টে দিতে চাইছেন। পদার্থবিদেরা এমনকি একথা নিয়েও তদ্বির চালাচ্ছেন যে, অতি বুদ্ধিমান বাইরের প্রাণীরা (aliens) এসে আমাদের মহাবিশ্বকে চালু করে দিয়ে চলে গেছে। গতমাসে নীল ডি গ্রাসে টাইসন বলেছেন "এমনটা হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি"। এখন বিষয়টা হলো যে, এটা কিন্তু মোটেই বিজ্ঞান নয়। একজন গাঁজাখোরের বানানো একটি কাল্পনিক পরীক্ষাকে (thought experiment) বিজ্ঞান বলে ভুল বোঝানো হচ্ছে। অনন্যতার (singularity) ধারণাটি নিয়েও দশা একইরকম। এই ধারণাটিকেও আমরা আমাদের মনোজগতে খোদাই করে নিচ্ছি (digitizing our psyches)—আমাদের কম্পিউটারেও ভরে নিতে চলেছি—যেখানে আমরা চিরকালের জন্য বেঁচে থাকবো। কিছু প্রভাবশালী মানুষ আছেন যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী। গুগলের কারিগরি বিভাগের ডিরেক্টর রে কুর্জউইলও এঁদের মধ্যে রয়েছেন। অথচ এই অনন্যতার চর্চাকে বিলয় কেন্দ্রিক একটি আরাধনা (apocalyptic cult) বলা যেতে পারে, যেখানে ঈশ্বরের স্থান নিয়েছে বিজ্ঞান। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা যখন অনন্যতার ধারণা—বহুবিশ্বের ধারণা—এসব আবোল তাবোল বিষয় নিয়ে প্রচারে নামেন, তখন তাঁরা আসলে বিজ্ঞানকেই আঘাত করেন। আর ঠিক তখনই ভূ-উষ্ণায়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির গুরুত্ব হারিয়ে যেতে থাকে।

ক্যান্সার নির্ণয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা নিয়ে বাড়াবাড়ি

এবারে চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনায় আসা যাক। বিকল্প চিকিৎসা (alternative medicine) এক্ষেত্রে নেহাতই নিরীহ প্রতিপক্ষ (soft target)—তাই তাকে বাদ দিয়ে প্রকৃত কঠিন প্রতিপক্ষ (hard target) হিসেবে শক্তিশালী মূলস্রোতের চিকিৎসা (mainstream medicine) বিষয়েই আমি মনোযোগ দিয়েছি। ওবামার আমলেই Obama-care নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। অনেকে দাবী করেন যে, আমেরিকান চিকিৎসা ব্যবস্থা নাকি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দাবীটি যার পর নাই মিথ্যা।

বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে আমেরিকা মাথাপিছু অনেক বেশি ব্যয় করে। এতদসত্ত্বেও গড় পরমায়ুর দিক থেকে আমরা পৃথিবীতে ৩৪ তম স্থানে। আমাদের অবস্থান কোস্টারিকার পাশাপাশি। অথচ

কোস্টারিকা মাথাপিছু খরচ করে আমাদের তুলনায় এক দশমাংশ। কীভাবে এমনটা হওয়া সম্ভব? স্বাস্থ্যের তুলনায় মুনাফাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই এটা হয়েছে বলে মনে হয়। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে চিকিৎসকেরা আর হাসপাতালগুলি নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক দামী দামী সব পরীক্ষা নিরীক্ষা। তারা এই বলে আমাদের আশ্বস্ত করছে যে, আগেভাগেই রোগনির্ণয় করে ফেলতে পারলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কোনো কোনো সময় আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভালোর চেয়ে ক্ষতি করে বেশি। গড় হিসেবে দেখা গেছে যে, ম্যামোগ্রামের সাহায্যে আগেভাগেই টিউমার নির্ণয়ের ফলে জীবন দীর্ঘতর হয়েছে, এমন প্রতি একজন উপকৃত মহিলার জন্য কমপক্ষে ৩৩ জন মহিলা অপ্রয়োজনীয় বায়োপসি, সার্জারি, রেডিওথেরাপি, এবং কেমোথেরাপি চিকিৎসা পেয়েছেন। প্রস্টেট ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য PSA পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনুপাতটা দাঁড়ায় ৪৭ জনপ্রতি একজন। কোলোনোস্কোপি এবং আরও নানা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একইরকম অনুপাত পাওয়া গেছে।

ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ধূমপান বেশি, আর তারা ক্যান্সার বাবদ খরচ করে কম। তথাপি আমেরিকানদের তুলনায় ইউরোপিয়ানদের ক্যান্সারে মৃত্যুর হার কম। আমেরিকানদের সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষাও বেশি—চিকিৎসাও বেশি—আর সবকিছুর চার্জও বেশি। এই জটিল সমস্যার বিষয়ে আরও জানতে হলে ডার্টমাউথের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্ভীক বিশ্লেষক গিলবার্ট ওয়েলচ-এর লেখা "Overdiagnosed" পড়ে দেখুন। তাঁর বইটির উপ-শিরোনাম হলো "Making People Sick in Pursuit of Health"।

মানসিক অসুখ ঃ চিকিৎসার বাড়াবাড়ি

মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন—একই ধরনের সমস্যায় ভুগছে। বিগত কয়েক দশক ধরে মার্কিন মনোচিকিৎসা ক্রমশই বৃহৎ ওষুধ সংস্থাগুলির এক বিক্রয় শাখাতে পরিণত হয়েছে। মানসিক অসুখের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ নিয়ে কুড়ি বছর আগে থেকে আমি সমালোচনা করে চলেছি। এটাই বলার চেষ্টা করেছি যে প্রোজ্যাক-এর মতো অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্টগুলি প্লেসিবোর (placebo) চাইতে বেশি কাজের কিছু নয়। আমার সমালোচনা, সেক্ষেত্রে নেহাত হাল্কা ধরনের ছিল বলেই মনে হয়। মনোরোগের ওষুধপত্র অল্প কিছুদিনের জন্য ভালো কাজ করলেও, দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শরীর দুর্বল হয়। সাংবাদিক রবার্ট হুইটেকার তাঁর লেখা 'Anatomy of An Epidemic' পুঁথিটির মধ্যে শেষমেশ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। নানা উদাহরণের সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন যে, ১৯৮০-র দশকের শেষভাগ থেকে মনোরোগের ওষুধ প্রেসক্রিপসন করবার ধূম পড়ে গিয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। ওষুধে ঠিকঠাক কাজ হলে মানসিক অসুস্থতার ঘটনা কমার কথা। পক্ষান্তরে, মানসিক অক্ষমতার (mental disability) ঘটনা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে—বিশেষভাবে শিশুদের মধ্যে। ওষুধপত্র নিজেই এই মহামারী তৈরি করছে, এমন একটা ধারণাকে হুইটেকার শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন।

মূল ধারার ওষুধের এইসব নানা ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে মানুষ বিকল্প ওষুধের সন্ধান করলে তাকে দোষ দেওয়াটা কি ঠিক হবে?

জিন বাতিকের বিজ্ঞান (Gene-Whiz-Science)

'Behavioral Genetics' হলো আমাদের আরেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ (hard target)—আর সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতেই হচ্ছে। আমাদের বিভিন্ন চালচলন, বিশেষ বিশেষ জিন দ্বারা পরিচালিত হয়—এমনই এক ধারণাকে ভিত্তি করে, যেকোনো কাজে প্রণোদনা জোগানোর জন্য দায়ী বিশেষ জিনটিকে খুঁজে বেড়ানোর এক প্রবল বাতিক দেখা যাচ্ছে। আমি একে বলি—Gene-Whiz-Science—জিন বাতিকের বিজ্ঞান। নামটি মিডিয়ার মনে ধরেছে, আর আমজনতাও বেশ নিয়েছে।

বিগত কয়েক দশক ধরে জিনবিশারদেরা একথাই শুনিয়ে আসছেন যে, সামান্য কোনো প্রলক্ষণ (trait) অথবা নগণ্য কোনো বিশৃঙ্খলার (disorder) পশ্চাতে

ক্রিয়াশীল জিনদের প্রায় সবই তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আমাদের ভাঁড়ারে এখনই রয়েছে ঈশ্বর-জিন (god gene), গে-জিন (gay gene), মদালস জিন (alcoholism gene), যোদ্ধা-জিন (warrior gene), লিবারাল-জিন, বুদ্ধিমত্তা-জিন (intelligence gene) সিজোফ্রেনিয়া-জিন, এবং আরও—আরও অসংখ্য।

কিন্তু জটিল কোনো প্রলক্ষণ অথবা বিশৃঙ্খলার সাথে একটি নির্দিষ্ট জিনের এধরণের সংযোগের কোনো প্রমাণই আমাদের হাতে নেই। অথচ, জিন সংক্রান্ত দাবী—একটার পর একটা—উঠছে তো উঠছেই। গত বছর 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় কর্নেল মেডিক্যাল কলেজের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ফ্রিডম্যানের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যেখানে দুটি জিন আবিষ্কার নিয়ে লেখা হয়েছে। সেখানে তিনি দাবী করেছেন যে, বিজ্ঞানীরা একটি জিনের সন্ধান পেয়েছেন, যার নাম 'ভালোলাগা জিন' (feel-good gene)—জিনটি আমাদের খুশি রাখে। খুঁজে পাওয়া অপর জিনটির নাম 'বিশ্বাসভঙ্গ জিন' (infidelity gene)—সঙ্গীর সাথে প্রতারণা করতে এই জিন নারী পুরুষকে প্রণোদিত করে। এমন একটি নির্বোধ প্রবন্ধ ছাপাবার জন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষের লজ্জিত হওয়া উচিত।

যুদ্ধের আদিম শিকড়ের তত্ত্ব

যুদ্ধ নিয়ে একটা জৈবনিক তত্ত্ব আছে, আর সেটা আমাকে রীতিমতো খেপিয়ে তোলে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আমাদের জিনের মধ্যেই নাকি লুকিয়ে আছে যুদ্ধের বাতিক। বলা হচ্ছে—দল বেঁধে হত্যা কান্ড ঘটানোর প্রবণতা আমাদের জিনের নির্দেশ। এর শিকড় নাকি খুঁজতে হবে লক্ষ লক্ষ বছর অতীতে—যখন আমাদের আদিম পূর্ব পুরুষ এবং শিম্পাঞ্জিরা আলাদা কিছু ছিল না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিভেন পিঙ্কার, রিচার্ড র‍্যাংহ্যাম এবং এডওয়ার্ড উইলসনদের মতো বেশ কিছু ভারভারিক্কি বিজ্ঞান পন্ডিত এ তত্ত্বটি নিয়ে ভালোরকম চর্চাও করেছেন। মাইকেল শারমার নামে একজন যুক্তিবাদী (Skeptic) অক্লান্তভাবে তত্ত্বটি সম্পর্কে ঢোল পিটিয়ে বেড়াচ্ছে। গণমাধ্যম আগ্রহ দেখাচ্ছে—কারণ রক্তপিপাসু শিম্পাঞ্জি অথবা প্রস্তর যুগের মানুষের আদিম হিংসক কাহিনী দর্শক শ্রোতারা নাকি ভালোই নিচ্ছে।

কিন্তু আমাদের হাতে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে যে, যুদ্ধ মানুষের সংস্কৃতিরই অবদান। মানুষের সংস্কৃতির গর্ভ থেকেই একদিন জন্ম নিয়েছিল যুদ্ধ। আজ থেকে খুব বেশি হলে বারো হাজার বছর আগে, তদানীন্তন সমাজ থেকে জন্ম নিয়েছিল—কৃষিকাজের কৌশল অথবা ধর্মীয় চিন্তাচেতনা কিংবা ক্রীতদাসপ্রথা। সেই একই সময়কালে আজকের যুদ্ধচেতনাও যে জন্ম নিয়েছে—সেটা একরকম প্রমাণিত।

যুদ্ধের আদিম শিকড়ের তত্ত্বটি আমি যে ঘৃণা করি তার কারণ কেবল এটাই নয় যে—তত্ত্বটি ভুল। ঘৃণা করার মূল কারণটি হলো যে, তত্ত্বটি আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে যে, যুদ্ধ আমাদের নিয়তি। আমি বলি, যুদ্ধ হল আমাদের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা। আমাদের ঘিরে রয়েছে আরও নানা ধরনের সমস্যা। ভূ-উষ্ণায়ণ, দারিদ্র্য, রোগব্যাধি, রাজনৈতিক শোষণ—এসব ছাড়াও অন্য হাজারো সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে এই যুদ্ধ—কখনও সরাসরি কখনও বা ঘুরপথে। কারণ, সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য গচ্ছিত টাকা পয়সা, সম্পদ, সব তখন যুদ্ধের খাতে সরিয়ে দেওয়া হয়।

যুদ্ধ কিন্তু সত্যি সত্যিই মানব সভ্যতার একটি কঠিন প্রতিপক্ষ। বেশিরভাগ মানুষ বোধহয় বিশ্বশান্তির ধারণাটিকে নেহাতই এক দিবাস্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দেন। সেই আদিম হিংসার তত্ত্বে আপনিও কী আস্থা রাখেন? আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, যুদ্ধ এতটাই সুপ্রাচীন এবং আমাদের ভেতরে এতটাই প্রোথিত—তাহলে মানব সভ্যতায় যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী সেটাও আপনি মেনে নিলেন। কী বলেন—ঠিক কিনা?

আপনারা একথা ভাবতেই পারেন যে, ধর্মীয় উন্মাদনা বিশেষ করে মুসলিম ধর্মীয় উন্মাদনাই বিশ্বশান্তির পথে প্রধান বাধা। এসব কথাই প্রচার করছেন, ডকিন্স, ক্রস, স্যাম হ্যারিস, জেরি কয়েন প্রমুখ ধর্মবিদ্বেষী তার্কিক (religion bashers) এবং সদ্যপ্রয়াত কট্টর যুদ্ধবাদী ক্রিস্টফার হিচেন্স। ধর্মকে ব্যঙ্গ করে এরাই আজকাল গলা ফাটাচ্ছেন।

আমি বলতে পারি, শান্তির প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বড়ো

ভয় হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ৯/১১ ঘটনার পর থেকে ইউ এস সেনা আফগানিস্তান, ইরাক এবং পাকিস্তানের যুদ্ধে ৩,৭০,০০০ মানুষকে হত্যা করেছে। যার মধ্যে ২,১০,০০০-এরও বেশি ছিল সাধারণ নাগরিক, এবং বলাই বাহুল্য এদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিশু। মনে রাখতে হবে যে, এসবই কিন্তু যথেষ্ট সংযত (conservative) হিসেব।

ইউ এস-এর কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে মৌলবাদী হাঙ্গামা বন্ধ হওয়ার বদলে তা আরও জটিল হয়েছে। ইউ এস এবং তার সহযোগীদের মুসলিমবিরোধী হিংসার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠেছে আইসিস। দেশের প্রতিরক্ষার নামে ইউ এস একাই যে পরিমাণ খরচ করে তা পৃথিবীর অন্য সব দেশের মিলিত খরচের সমান হবে। নতুন নতুন সমরাস্ত্র তৈরি করার ব্যাপারে আমরাই এগিয়ে। আর বিশ্বজুড়ে নতুন সমরাস্ত্রের আমরাই স্রষ্টা আবার আমরাই সেই অস্ত্রের সেরা ফেরিওয়ালা। পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার কথা বলেছিলেন বারাক ওবামা। অথচ, তিনিই দেশের সামরিক অস্ত্রভান্ডার আধুনিকীকরণের জন্য এক হাজার কোটি মার্কিন ডলারের পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছিলেন।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখানে নিতান্তই কমজোর। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে এবারে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বারনি স্যান্ডারসও ছিলেন। কিন্তু সেই দৌড়ে এমন একজনও ছিলেন না যিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই একজন যুদ্ধবিরোধী। আমেরিকান স্নাইপার—এর মতো সিনেমা দেখতে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে, যেখানে একজন শিশু হত্যাকারী, নারী হত্যাকারীর জয়গান রয়েছে। অথচ বিগত শতাব্দীতে দুনিয়া জুড়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা, ইউ এস মিলিটারিতন্ত্রের বিরুদ্ধে গলা তুলেছিলেন—যুদ্ধের শেষ দেখতে চেয়েছিলেন। আইনস্টাইন, লাইনাস পাউলিং-এর মতো বিজ্ঞানী, কার্ল সাগানের মত বিদগ্ধ মানুষের উত্তরসূরিরা আজ কোথায়? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কামান দেগে চলেছেন নোয়াম চমস্কি। তাঁর বয়স নব্বই হতে চলল। তাঁরও তো এবার কিছু সাহায্যের দরকার।

এদিকে মার্কিন মিলিটারিতন্ত্রকে সমালোচনা করার বদলে টাইলার কাউয়েনের মতো কিছু অর্থনীতিবিদ উল্টে দাবি করছেন যে যুদ্ধ নাকি উপকারী। এতে করে আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাকি বেড়ে যায়। দাসব্যবস্থা যে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক এ যেন তারই পক্ষে সওয়াল করা।

একটুখানি ফিরে বলি—আমি চাইছি যে—আপনারা যারা সংশয়বাদী (skeptic) অর্থাৎ যুক্তির অভাব থাকলেই সমালোচনা করে থাকেন, তাঁরা যেন হোমিওপ্যাথি অথবা ইয়েতি ইত্যাদি লঘু বিষয়গুলি (soft target) নিয়ে কম সময় ভাবেন। তার জায়গায় আপনারা বেশি বেশি করে নিশানা করুন বড়সড় বিষয়গুলিকে (hard targets)—যেমন বহুবিশ্ব তত্ত্ব, ক্যান্সারের রাশি রাশি পরীক্ষা, মনোরোগের ওষুধপত্র, আর নিশানা করুন যুদ্ধকে—সবচেয়ে বিপজ্জনক লক্ষ্য (hardest target of all) হিসেবে। আমি এতটা আশা করিনা যে, আমি যেভাবে বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করেছি, আপনারাও তার সাথে একমত হবেন। যেটা বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে, আপনারা নিজেদের ধারণাকেও একবার সংশয় নিয়ে ভাবুন। নিজেদের এটা অন্ততঃ প্রশ্ন করুন ঃ দাস ব্যবস্থার অবসান অথবা নারীমুক্তির মতোই একইভাবে যুদ্ধ বন্ধ করাটা কি একটা বিবেকের দাবি হতে পারে না? বা কেন আমরা যুদ্ধটাকে একেবারে বন্ধ করে দিতে পারছি না?

[মূল লেখাটির URL দেওয়া থাকলো ঃ https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/dear- skeptics-bash-homeopathy-and-bigfoot-less-mammograms-and-war-more/]

ধোঁয়াশায় শীতের দিল্লি আবার যেন গ্যাসচেম্বার

অপর্ণা চক্রবর্তী

E-mail : apachakrabarti@hotmail.com

শীতে দিল্লির ধোঁয়াশার ঘটনা প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বছরে ঐ সময় স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, পরিবহন ব্যবস্থা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি পর্যায়ই বিপর্যস্ত হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন, শিশু ও শ্বাসকষ্টে ভোগা মানুষদের জীবন দুর্বিসহ হচ্ছে। এই ঘটনা কেন ঘটছে ফি বছর? এর থেকে রেহাই পেতে কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? কি উদ্যোগই বা নেওয়া উচিত? এসব নিয়ে এ লেখা।

ক্রমশ: বাড়তে থাকা বায়ুদূষণ আর এর ফলে তৈরী হওয়া ধোঁয়াশা যা সারা পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিষয়টা নিয়ে লেখা (তিলোত্তমাও কি ক্রমশ: ধোঁয়াশার করাল গ্রাসে?—বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী; জানুয়ারী—ডিসেম্বর ২০১৭) শেষ করেছিলাম ২০১৭'র অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে, দীপাবলির ঠিক পরে। আশা আর আশঙ্কার দোদুল্যমানতায় মনে হয়েছিল কালীপুজো আর দেওয়ালীর বাজির ধোঁয়ায় সৃষ্টি হওয়া দূষককণা আর গ্যাস যখন দিল্লিতে ধোঁয়াশা তৈরী করতে পারেনি, তখন এই বছরের মত বোধহয় রেহাই পেল রাজধানী শহর। কিন্তু না, ৭ নভেম্বর ২০১৭ আগের বছরের চেনা বিভীষিকা আবার ফিরে এসেছে দিল্লিতে। ধোঁয়াশায় মুখ ঢেকেছে শহর, সাত সকালেই হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটছে গাড়িঘোড়া, কয়েকফুট দূরের জিনিস দেখা যায় না, দিনভোর সূর্যের দেখা মেলেনি। বেলা তিনটেয় শহরের বাতাসের গুণমান সূচক ধরা পড়েছে ৪৪৬, যা সুস্থ মানুষের শ্বাসযন্ত্রের পক্ষেও চরম বিপজ্জনক।

ধোঁয়াশা গিলছে দিল্লি ঃ শুরুর সে দিনের কথা

ধোঁয়াশায় ডুবে থাকা রাজধানীতে দ্বিতীয় দিনে (৮ নভেম্বর) বায়ুদূষণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য থেকে জানা যায় ঐদিন শহরে দূষণের মাত্রা হু নির্ধারিত মাত্রার থেকে প্রায় ১০ গুণ বেশী, বাতাসের গড় গুণমানসূচক ছিল ৪৮৪। দিল্লি প্রশাসন বয়স্কদের বাইরে যতটা সম্ভব কম বেরোনোর আবেদন জানিয়েছে, শহরের স্কুলগুলো বন্ধ। স্কুল পড়ুয়াদের ব্যাপারে সরকার কিন্তু বেশ তৎপর! ধোঁয়াশার প্রথম দিনেই তারা স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দেয় শহরের প্রায় ৬০০০ স্কুলের নার্সারি বিভাগ কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রাখার। দ্বিতীয় দিন সকালে দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া ইন্ডিয়া গেটের সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় একটা স্কুলবাসের জানালা দিয়ে ছাত্রদের বমি করতে দেখেন। এতে তিনি তড়িঘড়ি সব স্কুল এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। দিল্লি সরকার জানিয়েছে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের শিক্ষার চাইতে স্বাস্থ্যই বেশী কাম্য। ঠিকই তো! সুস্থ হয়ে বাঁচলে তবেই না নিতে পারবে শিক্ষা! এদিকে ঐদিন সকাল আটটা নাগাদ দিল্লি শহরের সর্বত্র ট্রাফিক সিগনাল অস্পষ্ট, মাস্ক পরিহিত দিল্লি পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা প্রবল প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যানবাহন নিয়ন্ত্রণের। তারই মাঝে খবর এল যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়ঙ্কর পথদুর্ঘটনার। ঘন ধোঁয়াশায় কিছুই দেখতে না পেয়ে পরপর ধাক্কা খেয়েছে ১২ টি গাড়ি, আহত হয়েছেন বেশ কিছু মানুষ। এইভাবে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় দিল্লি ও আশপাশে সড়ক দুর্ঘটনার হার বেড়ে গেছে, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ট্রেন ও বিমান চলাচল। ধোঁয়াশার প্রভাব পড়েছে মানুষের স্বাস্থ্যের উপরেও। হাসপাতাল ও ডাক্তারের চেম্বারে শ্বাসকষ্ট, চোখ-নাক-গলা জ্বালা আর কাশীর মত উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের চেষ্ট সার্জারী বিভাগের চিকিৎসক অরবিন্দ কুমার বলেছেন 'দিল্লির কোন কোন অংশে বাতাস এত দূষিত হয়ে পড়েছে যাতে শ্বাসগ্রহণ দিনে ৫০ টা সিগারেট খাওয়ার সমান'। তিনি আরও বলেন 'মানুষ একটাই উপায়ে বাঁচতে পারবে; স্কুল, কলেজ, অফিস সব বন্ধ করে দিল্লি ছেড়ে আপাতত: চলে যাওয়া'। সে তো আর সম্ভব নয়, রাজধানীর দু'কোটিরও বেশী মানুষকে ঐ গ্যাস চেম্বারে অসুস্থ হয়ে বাস করে যেতে হবে বছরের পর বছর। মানুষ নিজের মত কবে চেষ্টা চালাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার।

মুখোশ ও এয়ার পিউরিফয়ার-এর চাহিদা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, ৮০ থেকে ২২০০ টাকা দামের মাস্ক বিক্রি হচ্ছে ওষুধের দোকানে, যা অনলাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। এর সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে কালোবাজারী, যে সাধারণ মাস্ক সারা বছর ২০ টাকায় মেলে তা বিকোচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। তাও জোগানে ভাঁটা। মেট্রো ও বিমান বন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফের ১২ হাজার নিরাপত্তাকর্মীর হাতে মাস্ক তুলে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

কেন প্রতি বছর দিল্লিতে ধোঁয়াশার মরণ কামড়

দিল্লির এই তীব্র বায়ুদূষণ ও তার থেকে সৃষ্ট ধোঁয়াশার কারণসমূহ গণমাধ্যমের সুবাদে আজ আর কারও অজানা নয়। তাও কারণগুলো আর একবার মনে করা যেতে পারেঃ নয়ডা ও গুরগাঁও-এর প্রচুর শিল্প কারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (বাতাসের পার্টিক্যুলেট ম্যাটারের জন অনেকাংশে দায়ী), গত ১৫ বছরে গাড়ি বেড়েছে প্রায় ৯২ শতাংশ, এর মধ্যে অনেক যানবাহন ডিজেলচালিত, নিয়ম না মেনে নির্মাণকাজ চালানোয় তৈরী হওয়া ধুলো ও বিষাক্ত ধোঁয়া, দিল্লি শহরের উপকণ্ঠের ইটভাটা, পাথর খাদান, আবর্জনা পোড়ানো, ডিজেল জেনারেটর চালানো। এর মধ্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে ফসল কাটার পর কৃষিক্ষেতে পড়ে থাকা ফসলের অবশিষ্ট গোড়া পোড়ানোর ফলে তৈরী হওয়া ধোঁয়া, শীতের শুরুতে যখন উষ্ণতা কম থাকে আর বায়ু প্রবাহ ততটা হয়না তখন ধোঁয়াশার প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে ভারতবর্ষে প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন টন অবশিষ্টাংশ ফসল কাটার পর চাষের জমিতে পড়ে থাকে। এই ফসলের অবশিষ্টাংশ বেশীর ভাগটাই থাকে ভারতের 'ব্রেড বাস্কেট' বলে পরিচিত চারটি রাজ্যে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে। ফসল কাটার পর চাষের মাটি আবার বীজবপনের উপযোগী করে তোলার জন্য অবশিষ্ট গোড়াগুলো পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়াটাই সর্বাধিক প্রচলিত আর সস্তার পদ্ধতি। উত্তর ভারতের ঐ চার রাজ্যে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এই দহন প্রক্রিয়া শুরু হয়, শীতের শুরুতে ঐ ধোঁয়া পুরো উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের কিছু অংশকে ঢেকে ফেলে। ভৌগোলিক অবস্থান ও শিল্প এবং যানবাহনের আধিক্যের জন্য দিল্লির বায়ুদূষণ তথা ধোঁয়াশার পরিস্থিতি তীব্র আকাব ধারণ করে। নাসার পাঠানো উপগ্রহ চিত্র থেকে এই তথ্যের প্রমাণ মেলে। গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন দিল্লি শহর ধোঁয়াশায় কাবু তখনও নাসার তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঐ রাজ্যগুলোতে ফসলের গোড়া পোড়ানোর কাজ জোর কদমে চলছে। ভারতে সবুজ বিপ্লবের প্রাণপুরুষ এম এস স্বামীনাথন বলেছিলেন 'ভারতে কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতি যদি বরাবর পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা অক্ষুন্ন রাখতে পারে তাহলে সবুজ বিপ্লব চিরসবুজ হয়ে থাকবে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় সবুজ বিপ্লবের সূচনা পর্বের চাষের পদ্ধতি এখন আর মোটেই পরিবেশবান্ধব নয়। প্রতিবছর শীতের শুরুতে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে যে তীব্র বায়ুদূষণের প্রকোপ দেখা যায় তা প্রতিরোধ করতে হলে ঐ পদ্ধতি পাল্টানো আশু প্রয়োজন। দিল্লি সংলগ্ন রাজ্যের প্রধানেরা যে যার নিজের সিদ্ধান্তে অটল। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ফসলের গোড়া পোড়ানো বন্ধ করতে একেবারে রাজি নয়। তাঁর যুক্তি অন্য ভাবে ফসলের গোড়া নষ্ট করার মত যন্ত্র কেনার সামর্থ্য চাষীদের তো নেই-ই, রাজ্যেরও নেই। একমাত্র কেন্দ্র যদি সাহায্য করে তাহলেই তারা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী আবার ফসলের গোড়া পুড়িয়ে নষ্ট করার দায় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কারোর ঘাড়েই না চাপিয়ে সরাসরি কৃষকদের ঘাড়েই চাপিয়েছেন। তিনি জানান কৃষকরা যাতে ফসলের গোড়া পুড়িয়ে না দেন তার জন্য হরিয়ানা সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০০ কৃষককে ঐ অপরাধে জরিমানা করা হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝুন! কৃষকদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দেওয়া সহজতম বিকল্প, মুখ্যমন্ত্রী তাই সহজ পথটাই বেছে নিয়েছেন। সমস্যার মূলে গিয়ে কাজ করার ইচ্ছা কারোর নেই। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ফসলের গোড়া জ্বালানো হয় কেন, দিল্লির বায়ুদূষণের জন্য এই দহন জনিত ধোঁয়া কত অংশে দায়ী নেতা মন্ত্রীদের আলোচনায় এসব আসে না। এর সঙ্গে দিল্লি এবং পরিপার্শ্বে বিপুল নির্মাণ ব্যবসার কথা, ২০০০ সিসি-র বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনযুক্ত ডিজেলগাড়ি নিয়ন্ত্রণের কথা, নয়ডা এবং গুরগাঁও অঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রে ওপর নিয়ন্ত্রণের কথা : এ সমস্তও আলোচনায় আসে না, কারণ প্রত্যেকটা প্রশ্নই বিপজ্জনক, তার সঙ্গে অর্থ ও ক্ষমতার যোগ স্পষ্ট। এই প্রশ্নগুলোর পিছনে যে শক্তপোক্ত শ্রেণির মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে কৃষকদের মত সহজ টার্গেট বানিয়ে দেওয়া সোজা কথা নয়। নাগরিকদের বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নেওয়ার মত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার চেষ্টায় ঐ শক্তপোক্ত শ্রেণির

স্বার্থে ঘা দেবার কোন ইচ্ছা রাজনীতিকদের নেই। যাই হোক এর মধ্যে দুটো ছোট্ট কিন্তু গুরুত্ব পূর্ণ প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। ফসলের গোড়া ও অবশিষ্টাংশ না পুড়িয়ে তা জৈবশক্তিতে পরিণত করার জন্য পাঞ্জাব সরকার চেন্নাই-এর এক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে, ওই চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছরের কৃষি মরশুম আসার আগেই ৪০০টি কারখানা স্থাপিত হবে, খরচ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী আর. কে. সিংহের মধ্যস্থতায় এনটিপিসি খড় কিনে নিতে রাজি হয়েছে, জৈব শক্তির উৎস হিসাবে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে আগামী বছর ধোঁয়াশায় গত দুই বছরের মত বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরী হবে না বলে আশা করা যায়।

ধোঁয়াশার দাপট দমনে সরকারী দাওয়াই

পরিবেশ কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দিল্লি শহরের প্রবল বায়ুদূষণ প্রতিরোধে প্রশাসন সারা বছর কি কাজ করে জানা যায় না, অন্তত সেই কাজের কথা সংবাদমাধ্যমের পাতা পর্যন্ত পৌঁছয় না। কিন্তু গত ২০১৬-১৭'র শীতকালের মত এবারেও নাকি শীতাকলের ধোঁয়াশা নিয়ন্ত্রণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে প্রশাসন। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে চপার দিয়ে শহরে জল ছেটানো, দমকলের হোসপাইপ দিয়ে জল ছেটানো, অ্যান্টি স্মগ গান দিয়ে শহরের বেশী দূষিত এলাকায় জল স্প্রে করা ইত্যাদি উল্লেখের দাবি রাখে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় অ্যান্টি স্মগ গান দিয়ে জল স্প্রে করে বায়ুদূষণ কমানোর প্রচেষ্টা প্রথম দেখা গিয়েছিল চীনে। আমাদের রাজধানী শহরে এই যন্ত্রের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার হয় ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আনন্দ বিহার মেট্রো ষ্টেশনের বাইরে, যে এলাকার বায়ু সবচেয়ে দূষিত বলে অভিযোগ ছিল। দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী ইমরান হোসেনের উপস্থিতিতে পরিবেশ দপ্তর ও দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি এই পরীক্ষা চালায়। যন্ত্রটি থেকে অতি সূক্ষ্ম জলকণার (atomised water) ধারা ৫০ থেকে ৭০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত স্প্রে করা যায়। যন্ত্রটি থাকে একটি চলমান চার চাকার গাড়িতে, আর সঙ্গে লাগানো থাকে জলের ট্যাঙ্কার; সেখান থেকে জল নিয়ে বাতাসে স্প্রে করে মেশিন, অ্যান্টি স্মগ গান মূলত বাতাসে ভাসমান পি এম ২.৫ এবং পি এম ১০ কণা গুলোকে জলে ভিজিয়ে মাটিতে নামিয়ে আনে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর আনন্দ বিহার চত্বরে অ্যান্টি স্মগ গান ব্যবহারের দিন বাতাসের গুণমাণ সূচক ছিল ৪১৩, জল স্প্রে করার পর যা কমে দাঁড়ায় ৩৪৬। ধোঁয়াশা পরিস্থিতির উন্নতি করতে দিল্লি সরকার বেশ কিছুদিন বেশী সংখ্যায় মেট্রো চালানোর ব্যবস্থা করে এবং ব্যস্ত সময়ে মেট্রোর ভাড়া কমিয়ে দেয়, এর সঙ্গে গাড়ি পার্কিং-এর চার্জ চারগুণ করে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হল রাস্তায় গাড়ির সংখ্যার কমানো ও বেশী সংখ্যক মানুষকে মেট্রো ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু বর্ধিত পার্কিং পার্ক ফি এড়াতে দেখা যায় মানুষ রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে গাড়ি পার্ক করছে, এতে যানজট আরও বেড়ে যায়। প্রবল দূষণ সামলাতে প্রশাসন জোড় ও বিজোড় নম্বরের যানবাহনগুলিকে আলাদা আলাদা দিনে রাস্তায় নামার নিয়ম চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহিলাদের, সরকারী কর্মচারীদের ও দু'চাকার গাড়িগুলিকে এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়। কিন্তু পরিবেশ আদালতের চাপে সরকার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। আলাদতের যুক্তি, কিছু গাড়িকে এই বিধিনিষেধের আওতা থেকে বাদ দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, ৫০০ টি গাড়ি কমিয়ে ১০০ টি মোরবাইক বা স্কুটার চালালে, বায়ুদূষণ কমবে না, কারণ দু'চাকার গাড়িতে বেশী হয় বায়ুদূষণ। কানপুর আই আই টির এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এই মুহূর্তে দিল্লিতে গাড়ির সংখ্যা এক কোটির কিছু বেশী, যা দিল্লির বায়ুদূষণের জন্য নয় শতাংশ দায়ী। ঐ দূষণের বেশীর ভাগটার কারণ ৬৫ লক্ষ মোটর বাইক ও ৮৫ হাজার অটো। এই মোটরবাইক আর অটো বন্ধ করে দিলে দিল্লির অর্থনীতি একদম ভেঙে পড়বে। এদিকে রাজধানীর ভয়াবহ দূষণ থেকে বাঁচতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দপ্তর এবং বাছাই করা আরও কয়েকটি সরকারী অফিসের (নীতি আয়োগ, স্বাস্থ্য, কৃষি, পর্যটন, স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রক) জন্য কেনা হয়েছে ১৪০ টি এয়ার পিউরিফয়ার। এগুলি কেনা হয় ২০১৪ থেকে ২০১৭-র মধ্যে এবং এর জন্য খরচ হয় প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু গ্যাস চেম্বার দিল্লির দূষণ থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে রাজধানীর কোনও স্কুলে এয়ার পিউরিফায়ার বসানোর পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে দিল্লি প্রশাসনের সরকারী আধিকারিকরা। সিদ্ধান্ত যা নেওয়া হয়েছে, একেবারেই সঠিক! মন্ত্রী আমলারা দেশের কাজ করেন, তাঁরা নামী দামী মানুষ, তাই তাঁদের চোখ-নাক-গলা-ফুসফুস সবই দামী। স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের শরীরের ঐ অঙ্গগুলোর অত

গুরুত্ব নেই, তাই তাদের জন্য সুরক্ষারও ব্যবস্থা নেই। এদিকে রাজধানী শহরে প্রচুর উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের বাস, তার সঙ্গে নামী দামী বেসরকারী স্কুলেরও যথেষ্ট আধিক্য। এরা নিশ্চয়ই নিজেদের উদ্যোগে এয়ার পিউরিফায়ারের ব্যবস্থা করবে নিজস্ব সুরক্ষার তাগিদে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল! ভারতের রাজধানীও ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে চীনের 'বেজিং' এর মত এক শহরে দু'শহরের বাস।

ধোঁয়াশার নিয়ন্ত্রণ ঃ কার দায় তা নিয়েই ধোঁয়াশা

রাজধানী শহরের বায়ুদূষণ তথা ধোঁয়াশা পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়ে গেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরস্পরকে দোষারোপের পালা। কেন্দ্র এই সংকটজনক পরিস্থিতির যাবতীয় দায় দিল্লি প্রশাসনের দিকে ঠেলে দিতে ব্যস্ত। এদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আরবিন্দ কেজরিবালের অভিযোগ দিল্লিতে এখন ৫৫০০ বাস চলে, প্রয়োজন আরও নতুন ১১ হাজার বাসের। আইনের গেরোয় পড়ে গত ৭ বছর ধরে নতুন বাস কেনা যায়নি। বাইরের ট্রাক শহরে ঢোকা বন্ধ করার জন্য দিল্লি প্রশাসন শহরের বাইরে ট্রাক টার্মিনাল তৈরী করতে চান, তাতে যানজট কমবে, রাস্তার ধুলো ও বিষাক্ত গ্যাস থেকেও শহর রক্ষা পাবে, এতে নাকি বাধ সেধেছেন দিল্লির কেন্দ্র মনোনীত উপরাজ্যপাল। উল্লেখ করা যেতে পারে একটি তথ্যের অধিকারে জানা পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্য বলছে দূষণ সেস বাবদ দিল্লি সরকার গত দু'বছরে যা সংগ্রহ করেছে তার মাত্র ০.১২ শতাংশ অর্থ দূষণ নিয়ন্ত্রনে ব্যয় হয়েছে, আর সেই ব্যয়ও বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন যানবাহন কেনার কাজে। এই তথ্য প্রকাশ হওয়ায় সরকার তড়িঘড়ি ৫০০ টি বিদ্যুৎ চালিত বাস কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে কেন এতদিন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি? সেখানেও ওই একই উত্তর : দিল্লির উপরাজ্যপালের বাস ডিপোর জন্য প্রয়োজনীয় জমির ছাড়পত্র না দেওয়া। এই কেন্দ্র রাজ্য চাপান উতোরের মাঝখানে পড়ে প্রতি শীতে রাজধানীবাসীর নাভিশ্বাস ওঠে। সাধারণ মানুষ বুঝেই উঠতে পারে না কে ঠিক আর কেই বা ভুল। আসলে ক্ষমতার মোহের কাছে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেশকাল ভেদে কোন সময়েই গুরুত্ব পায় না। যাই হোক এই পরিস্থিতিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ট্যুইট : ''দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই, এটি জাতীয় সমস্যা, কেন্দ্রের উচিত দিল্লি, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা।'' কিন্তু দিল্লির সারা বছরের বায়ুদূষণ আর শীতকালীন বাৎসরিক ধোঁয়াশা যে সত্যিই জাতীয় সমস্যা সে কথা সাধারণ মানুষ বুঝলেও রাজনীতিকরা বোঝার চেষ্টা করেন না বা বুঝেও না বোঝার ভান করেন। নাহলে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী বলেন, 'বায়ুদূষণ মন্দ ঠিকই, তবে তাতে প্রাণহানি হচ্ছে এমনটা দাবি করা খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।' ভাবটা এমন, যেন প্রাণহানি না হলেই হল, মানুষের সুস্থ শরীরে বাঁচতে চাওয়াটা একটা অন্যায় আবদার।

বায়ুদূষণের জেরে লণ্ডভণ্ড শহর ও বিশ্ব ধোঁয়াশা দিসব

গত কয়েক বছর ধরে প্রবল দূষণের দরুণ কুয়াশা-ধোঁয়াশার দাপট বেড়ে চলায় উত্তর ভারত দিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করাটা এখন যাত্রীদের কাছে কার্যত বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলো ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা দেরী করে গন্তব্যে পৌঁছচ্ছে। এক রেল আধিকারিকের কথায় 'কুয়াশা ও টেন জটের প্রভাব সব থেকে বেশী উত্তর ভারতের মোগলসরাই থেকে নয়াদিল্লি পর্যন্ত। ফি বছরই যেন বেড়ে চলেছে কুয়াশার উপদ্রব। এ বছর শীতের শুরু থেকেই কুয়াশায় নাজেহাল রেল।' এই অবস্থায় ট্রেন চালাতে নতুন প্রযুক্তি ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছেন না রেলকর্তারা, কিন্তু বিমানের ক্ষেত্রে সেই প্রযুক্তি এলেও রেলের হাতে এখনও আসেনি। ফলে যাত্রীদের দেরী ও ভোগান্তির সমস্যা মেটানোর যাবতীয় আশা কুয়াশাতেই আচ্ছন্ন বলে জানাচ্ছেন রেলকর্তারা। এদিকে বিমান যাতে ঘন কুয়াশাতেও নামতে পারে তার জন্য অত্যাধুনিক ইনস্ট্রুমেনটাল ল্যাণ্ডিং সিস্টেম (ILS) ক্যাট থ্রি-বি রয়েছে দিল্লিতে। এতে দৃশ্যমানতা কমে ১২৫ মিটার হয়ে গেলেও বিমান ওঠানামা করতে পারে। কিন্তু শীতকালে মাঝে মাঝে দৃশ্যমানতা এত কমে যায় যে এই আধুনিক প্রযুক্তিও কাজ করতে পারে না, ফলে বিমানের উড়ানসূচি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় দিল্লি বিমানবন্দরের। এরকম দিনগুলোতে ধোঁয়াশার জেরে বাতিল হয় অনেক উড়ান, মুখ ঘুরিয়ে অন্য শহরে উড়ে যায় বিমানবন্দরে নামতে আসা বেশ কিছু বিমান, ছাড়তে দেরী করে বিমানবন্দরে অপেক্ষারত বিমানগুলো। দেশের রাজধানীর বিমানবন্দরের এই লণ্ডভণ্ড

অবস্থার জন্য দিনভর দেশের অন্যান্য শহরেও উড়ানের দেরী হয়ে যায়, আন্তর্জাতিক স্তরের সংযোগকারী বিমানগুলোও এই অবস্থায় অসুবিধার মুখে পড়ে যায়। রাজধানী শহরের এই ভয়ংকর দূষণের ফলে পর্যটন শিল্পও ক্রমশ ক্ষতির মুখে পড়ছে বলে জানিয়েছে বণিকসংস্থা অ্যাসোচেম। বিদেশীরা তো বটেই দিল্লি জয়পুর আগ্রা এড়িয়ে যাচ্ছেন দেশী পর্যটকরাও। এবারের ধোঁয়াশা শুরু হওয়ার প্রায় একমাস পরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ করে আবার দূষণ অনেক বেড়ে যায় দিল্লিতে। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ফিরোজ শাহ কোটলা ময়দানে ভারত শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ সারাদিন ধরে ফ্লাডলাইট জেলে চালাতে হয়, মাঝে একদিন ধোঁয়াশার দাপটে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধও রাখতে হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা মাঠে মাস্ক পরে ফিল্ডিং করেন, ইনহেলারও ব্যবহার করতে বাধ্য হন তারা। শ্রীলঙ্কায় দূষণের পরিমান তুলনায় কম, ওদের খেলোয়াড়রা তাই নিঃশ্বাসে বিষপান করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। ৫ ডিসেম্বর ২০১৭-য় ম্যাচ চলাকালীন শ্রীলঙ্কার সুরঙ্গা লাকমল ও ভারতের মহম্মদ শামি বারবার বমি করে অসুস্থ হয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়। প্রবল দূষণের মধ্যে টেস্ট ম্যাচের আয়োজন করায় খেলার উদ্যোক্তা ও দিল্লি সরকারের সমালোচনায় সরব হয় জাতীয় পরিবেশ আদালত। এই ঘটনায় লজ্জায় মাথা হেঁট করা ছাড়া আর কিই বা করার আছে ভারতবাসীর! ঘটনাক্রমে এই দিনই (৫ ডিসেম্বর) 'আন্তর্জাতিক ধোঁয়াশা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নিল রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ দপ্তর (United Nation Environment Programme বা UNEP)। এই দিনই বিখ্যাত লন্ডন স্মগের ৬৫ বছর (৫ থেকে ৯ ডিসেম্বর ১৯৫২) পূর্ণ হয়। আন্তর্জাতিক ধোঁয়াশা দিবস পালনের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায় না থাকলেও খানিকটা ভূমিকা ভারতের রাজধানীরও রয়েছে। UNEP-এর তরফে জানানো হয়েছে, পৃথিবীতে প্রতিবছর ১৮০০০ মানুষ ধোঁয়াশার কারণে মারা যায়। ঐ সব অকালমৃত মানুষদের স্মরণে এবং পৃথিবীর দুটো বিখ্যাত শহর গ্রেট ব্রিটেনের লণ্ডন ও ভারতের দিল্লির বায়ুদূষণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সারা বিশ্বের মানুষকে জানানোর জন্য এই 'আন্তর্জাতিক ধোঁয়াশা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই দিনটি বিশেষ ভাবে পালনের লক্ষ্য হল প্রতিটি মানুষ যে বাতাসে শ্বাসগ্রহণ করছে তার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বার্তা সবদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। মানুষ জীবনে অনেককিছুই পছন্দ করে নেবার সুযোগ পায়। কিন্তু প্রতিটা মানুষ যখন যেখানে থাকে সেখানকার বাতাস যত দূষিতই হোক না কেন তারা প্রত্যেকেই সেই বাতাসে শ্বাসগ্রহণ করতে বাধ্য হয়, এখানে তাদের পছন্দের কোন সুযোগ থাকে না। UNEP-সূত্রে জানা যায় একজন মানুষের সারাজীবনের শ্বাসকার্যের জন্য মোটামুটি ২৫০ মিলিয়ন লিটার বাতাসের প্রয়োজন হয়। আন্তর্জাতিক ধোঁয়াশা দিবস সেই সবুজগ্রহের দিশায় চিন্তাচেতনাকে চালিত করবে যেখানে বাতাস হবে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত, যে বাতাসে মানুষ নিশ্চিন্তে শ্বাস নিতে পারবে।

আদালতের হস্তক্ষেপ ও নজরদারী

এবারে দিল্লি শহরে ধোঁয়াশা শুরুর পরদিনই দিল্লি হাইকোর্ট এই ধোঁয়াশাকে লন্ডন স্মগের মত ঘাতক ধোঁয়াশা আখ্যা দিয়ে শহরের অবস্থাকে 'আপৎকালীন পরিস্থিতি' বলে ঘোষণা করে। রাজ্য সরকারকে বাতাসের কণাদূষণ কমানোর (pm এবং ধুলো) জন্য জরুরী ভিত্তিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানোর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেয়। জাতীয় পরিবেশ সচিবকে তিনদিনের মধ্যে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের মুখ্য সচিবদের সঙ্গে আলোচনা করে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে দ্রুত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। দূষণের তৃতীয় দিনে জাতীয় পরিবেশ আদালত দিল্লির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করে বলে 'মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারই তো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' সারাবছর বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন কেন চেষ্টা করেনি সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। ফসলের গোড়া জ্বালানো, নির্মানকাজ, দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-কারখানা, শহরে ডিজেলচালিত ট্রাকের প্রবেশ প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দেয় পরিবেশ আদালত। এর সপ্তাহখানেক পর দূষণ পরিস্থিতি একটু নিয়ন্ত্রণে এলে নির্মাণকাজ এবং ট্রাকের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আবার তুলে নেয় এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলো কিভাবে ঐ প্রবল ধোঁয়াশা জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে তার অ্যাকশন প্লান দু'সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে বলে। যদি রাজ্যগুলো দু সপ্তাহের মধ্যে অ্যাকশন প্ল্যান জমা না দিতে পারে তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিকদের বেতন থেকে দৃষ্টান্তমূলক জরিমানার অর্থ কেটে নেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করে আদালত। এর ফলে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে দিল্লি ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলো দায়সারা গোছের পরিকল্পনা পেশ করে আদালতে। অতিমাত্রায় দূষণ রুখতে ঐ পরিকল্পনা

পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়ে আদালত রাজ্যগুলিকে আবার নতুন পরিকল্পনা পেশ করতে বলে। রাজধানীর বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের হাত ধরে বেশ কিছু বছর আগেই। সি এন জি চালিত বাণিজ্যিক গাড়ি প্রচলন থেকে শুরু করে পরিবেশবিদ ভূরে লালের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তৈরী হওয়া সবই হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। এবারের প্রবল ধোঁয়াশার মোকাবিলায় বিভিন্ন সরকারী সংগঠন যেমন জাতীয় পরিবেশ আদালত, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ, দিল্লি হাইকোর্ট, ভূরে লালের পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সবাই একযোগে কোমর বেঁধেছে। (এত কড়া নজরদারী সত্ত্বেও প্রতিবছর শীতকালে বিষ ধোঁয়ার জ্বালায় শহরবাসী কেন নাজেহাল হয় জানা যায় না।) এর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজধানীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে আবার সেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী রাজকুমার কপূর। তাঁর আর্জি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার, দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ সরকারেকে রাস্তার ধুলো ও ফসলের গোড়া জ্বালানো বন্ধ করতে নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট, এর সঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎচালিত গাড়ির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সঠিক পদক্ষেপ নিক। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দেশ জারি করে। এই বছর (২০১৮) জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র সরকার সুপ্রীম কোর্টে জানায় যে সরকার ফসলের অবশিষ্টাংশের দহন নিয়ন্ত্রণে দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থান এই রাজ্য সরকারদের ১০০০ কোটি টাকা সাহায্য দেবে। ২০১৮-১৯-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে আবার অর্থমন্ত্রী ঐ রাজ্যসমূহের কৃষকদের জন্য বিশেষ অনুদান প্রকল্প ঘোষণা করেন। চাষীরা যদি বীজবপনের মেশিন আর যন্ত্রচালিত লাঙল (rotavator) কিনতে চায় তাহলে তাদের ব্যক্তিগত স্তরে সরাসরি ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেবে সরকার। কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা গ্রাম পঞ্চায়েৎ এলাকার কৃষকদের গ্রুপ এই ধরনের যন্ত্র কিনতে চাইলে ৭৫ শতাংশ সরকারী সাহায্য মিলবে। এই ব্যবস্থায় ফসলের অবশিষ্টাংশ আর পোড়ানোর প্রয়োজন হবে না। EPCA (Environment Pollution Prevention and Contral Authority)-র সদস্যা ও CSE -র অধিকর্তা সুনীতা নারাইন কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত EPCA রিপোর্টটা দেখেছে। ১০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি একটা ভাল পদক্ষেপ কিন্তু এটা দ্রুত কার্যকর হওয়া দরকার। বাজেটে গৃহীত অনুদান প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ন প্রয়োজন, যাতে পরবর্তী শীতকালের আগে মেশিনগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়।' প্রসংগত উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্ট ২০১৭-র অক্টোবরের শুরুতে শব্দবাজি ও আতসবাজি পোড়ানোর ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কোর্ট তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে যুক্তিগ্রাহ্য নির্দেশ জারি করে। কিন্তু সেই নির্দেশ পালনের জন্য সরকার আর নাগরিক সম্প্রদায় এগিয়ে না এলে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ঋতুর মত ধোঁয়াশাও নিয়ম করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে রাজধানী শহরকে অধিকার করে নেয়। সারা বছর ধরে ঘটে চলা বায়ুদূষণ শীতকালে আবহাওয়া ও কম উষ্ণতার কারণে তীব্র ধোঁয়াশার আকার ধারণ করে রাজধানীকে প্রায় অচল করে দেয়। পুরো বছর ধরে বায়ুদূষণের যথেষ্ট প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় পরিস্থিতি যখন হাতের বাইরে চলে যায় তখন গেল গেল রব ওঠে। এবারও কি দিল্লির দু'কোটি মানুষকে ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিতে হবে আগামী শীতের ধোঁয়াশার বিষবাষ্পের সংগে লড়াই-এর জন্য!

শেষের কথা

এইবছর, অর্থাৎ ২০১৮-১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গৃহীত সরকারী পদক্ষেপে দিল্লির ধোঁয়াশা দমনে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে কেবল ফসলের অবশিষ্টাংশের দহন নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। যেন দিল্লির বায়ুদূষণ সমস্যার একমাত্র কারণ ফসলের গোড়ার দহন! বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানো শিল্প কারখানা, উন্নয়নের নামে নিয়ম কানুননের তোয়াক্কা না করে চলা নির্মাণকাজ, ডিজেল চালিত যানবাহন ও জেনারেটরের ব্যবহার : এ'সব নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়াস সরকারী ব্যবস্থায় চোখে পড়ে না। জনসাধারণের ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় রাশ টানতেও কার্যত কোন উদ্যোগ নেই। বরঞ্চ সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে দিল্লি তথা ভারতের বড় শহরগুলো আজ দেশী বিদেশী গাড়ি কোম্পানীগুলোর চোখের মনি। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোতে বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যেখানে সাইকেলের মত পরিবেশবান্ধব যানবাহনের ব্যবহারে উৎসাহ দিয়ে রাষ্ট্র বায়ুদূষণে লাগাম টেনেছে সেখানে ভারতের রাজধানী ও বড় বড় শহরে এ ধরণের উদ্যোগের অভাব চোখে পড়ে।

তাই মনে হয় দূষণ দমনে ফসলের গোড়া পোড়ানোকে কারণ দর্শানো রাষ্ট্রের অজুহাত মাত্র, আসল সমস্যার উৎস সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। ইউরোপে বায়ুদূষণ তথা সামগ্রিক পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে জনমত অনেক আগে থেকেই সক্রিয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই দূষণ এক প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং দলগুলোর প্রধান নির্বাচনী কর্মসূচীতে পরিবেশ প্রসঙ্গ প্রবলভাবে উপস্থিত থাকে। আমাদের দেশের কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে পরিবেশ প্রসঙ্গ স্থান পায় না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসা ইস্তক স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান তুলেছেন। এই স্বচ্ছ ভারতের প্রচার সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, রাস্তাঘাটের হোর্ডিং, ট্রেনের কামরা সর্বত্র, কিন্তু স্বচ্ছ ভারত মানে কি শুধু ঝাড়ু হাতে রাস্তা আবর্জনামুক্ত করা আর টয়লেট নির্মাণ! ছোটদের পাঠ্যপুস্তকের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের রীতি নীতি মুখস্থ করানো বা দিল্লির জাতীয় গ্রীন ট্রাইব্যুনালের প্রিন্সিপাল বেঞ্চের নির্দেশ মেনে দেশজুড়ে সব স্কুল ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপনের ব্যবস্থা করলেই জল-বায়ু-মাটি দূষণ মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ ভারত আত্মপ্রকাশ করবে না। ছোটরা তো উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে বৃক্ষরোপন ইত্যাদি করবে আর স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরের শহরে দেখবে বড়রা পরিবেশের নিয়মনীতির পরোয়া করে না। শহরের যেটুকু সবুজ অবশিষ্ঠ আছে তা ধ্বংস করে আধুনিক বিলাসবহুল আবাসন, ঝাঁ চকচকে শপিং মল, সুসজ্জিত ফ্লাইওভার, রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যস্ত বড়রা। আশার কথা, সংবাদপত্র এবং পরিবেশকর্মীদের ক্রমাগত প্রচারের দরুণ সাধারণ মানুষ আজ কিছুটা হলেও চারপাশের জল, বাতাস, মাটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ পরিবেশকর্মীরা "Peoples' March for Environment" নামে এক পদযাত্রার আর আয়োজন করে। টাইগার হিল থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত ৩৩ দিন ব্যাপী এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানো। ১১টি জেলা অতিক্রম করে এই পদযাত্রা কলকাতায় পৌঁছয় ২০ মার্চ। 'সবুজ মঞ্চ' কলকাতার প্রেস ক্লাবে পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সংবর্ধনা দেয়। ঐ সংবর্ধনা সভায় আসন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে পরিবেশকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেণ্ডা করার আবেদন জানানো হয় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে। এইভাবে লাগাতর প্রচারে জনগণের পরিবেশে সচেতনতা হয়ত ধীরে ধীরে বাড়বে, তবে অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের কাণ্ডারীদের টনক কি কোনদিন নড়বে? পরিবেশের ক্ষতি করে লাগামছাড়া উন্নয়নের শরিক আজ আমরা সবাই : দেশনেতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত। উন্নয়নের যে রূপরেখা মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে তা সুস্থিত উন্নয়ণ কিনা ভেবে দেখার সময় এসেছে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, যাদের অঙ্গুলিহেলনে দেশের নীতি নির্ধারণ হয় তাদের এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। অগ্রগতির প্রচলিত মডেল পাল্টে যুগোপযোগী করে তোলার দায়িত্ব দেশনেতাদের। তাঁরা যদি এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন তাহলে পরিবেশ-কর্মীদের দূষণ নিয়ন্ত্রণে বারবার কোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে না, আর দিল্লির মত তথাকথিত উন্নত শহরগুলো দূষিত বায়ুর প্রকোপ থেকে মুক্তি পাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. https : // m.hindustantimes.com>delhi-news
2. https : // www.thethirdpole.net.in/2017/11/10 from bread busket
3. https : // economictimes.indiatimes.com
4. https ://www. unenvironment.org/news-and-stories/commemorating-smogday
5. nagarikmancha.org>uncategorized
6. The statesman: 08, 09, 10 November and 06 December, 2017
7. আনন্দবাজার পত্রিকা : ৮—১০, ২০, ২৫ নভেম্বর , ৬, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭। ১,২ জানুয়ারী, ১৮ মার্চ, ২ এপ্রিল, ২০১৮।
8. এই সময় সংবাদপত্র : ৮—১০, ২০, ২৫ নভেম্বর ২০১৭।

জনপ্রতি যানবাহন সংখ্যা

আমাদের দেশে জনসংখ্যা অনুপাতে যানবাহনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে। এই শহরে বাস করেন প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ আর মোট গাড়ির সংখ্যা ৩৬.৯৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। পুণে হল ভারতের প্রথম শহর যেখানে মানুষের চেয়ে গাড়ীর সংখ্যা বেশী। পুণের রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার অরুণ ইয়োলার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত ঐ শহরে নথিভুক্ত গাড়ীর সংখ্যা ৩৬,৯৬,৫৩১। এর মধ্যে মোটরবাইক ও স্কুটারের সংখ্যা ২৭,৫৬,৯৫৭। বাকি অংশ মোটরগাড়ি, ক্যাব, বাস, ট্রাক, টেম্পো ও অটোরিক্সা। পুণে ছাড়া দিল্লি, ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই ও হায়দ্রাবাদ-এর মত শহরগুলোতেও জনসংখ্যা অনুপাতে যানবাহনের ঘনত্ব মাত্রা ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে দিল্লির জনসংখ্যা চলতি বছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় ১.৯৫ কোটি (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই সংখা ১.৬৮ কোটি)। ২০১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত দিল্লি সরকারের পরিবহন দপ্তরের নথিভুক্ত গাড়ির সংখ্যা ১,০৫,৬৭,৭১২, এর মধ্যে ব্যক্তিগত মোটর গাড়ির সংখ্যা ৩১,৭২,৮৪২, স্কুটার আর মোটরবাইক মিলিয়ে ৬৬,৪৮,৭৩০, বাকি যানবাহনের মধ্যে পড়ে ক্যাব, বাস, ট্রাক, টেম্পো ও অটোরিক্সা। দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা অনুপাতে গাড়ি তথা দু'চাকার গাড়ির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী পুণে শহরে। এই শহরে গণ পরিবহন ব্যবস্থা অপ্রতুল, রাস্তাঘাট সংকীর্ণ এবং সেখানে গাদাগাদি ভিড়। তাই বাসের মত বড় মাপের যানবাহন শহরের রাস্তা পার হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এইসব কারণেই বোধহয় পুণের নাগরিকদের মোটর বাইক প্রীতি অনেকদিন আগে থেকেই গোটা দেশে সুপরিচিত। মেট্রো চালু হলে সমস্যা কিছুটা কমবে বলে মনে করছেন শহরবাসী। Ernst & Young India -র সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২০ সালে আমাদের দেশে যানবাহনের সংখ্যা ২০১৫-র তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অটো মার্কেটে পরিণত হবে। দেশী বিদেশী গাড়ি কোম্পানীগুলোর কাছে সুখের খবর কিন্তু দেশের পরিবহন ব্যবস্থাপনা এবং বাতাসের গুণমানের নিরিখে খবরটা ভারতবাসীর কাছে চরম দুঃসংবাদ।

তথ্যসূত্র ঃ https://www. livermind. com>india, আনন্দ বাজার পত্রিকা ০৭. ০৪. ২০১৮

নিয়মিত প্রকাশিত হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা

নিজে পড়ুন ও অন্যদের পড়ান

অসুখ বিসুখ- 254 লেক টাউন B ব্লক (M:903899493)

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য, শ্রমজীবী হাসপাতাল-বেলুড় (বালি)-এর মুখপত্র

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস ও কলকাতা সাইকেল সমাজ

মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং সুস্থায়ী ও সর্বাত্মক উন্নয়ণের লক্ষ্যে সাইকেলের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করার জন্য ২০১৮ সালের ১২ এপ্রিল রাষ্ট্রপুঞ্জ ৩ জুন দিনটিকে 'বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস (World bicycle day) হিসাবে ঘোষণা করেছে। এর আগে জার্মানির বন শহরে আয়োজিত শেষ পরিবেশ বৈঠকে (COP ২৩, ৬—১৭ নভেম্বর ২০১৭) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশবান্ধব যান হিসাবে সাইকেলের ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। UNO-র অধিকর্তা জেনেভায় বলেন 'সাইকেল চালানোর মত শারীরিক সক্রিয়তা শুধুমাত্র যে সুস্থায়ী উন্নতির লক্ষ্যে এগোতে সাহায্য করে তা নয়, এই অভ্যাস মানুষের মধ্যে ধৈর্য, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা এবং সততার মত মানবিক মূল্যবোধগুলো জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এই মানবিক গুণাবলীর ওপরেই সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভরশীল।' রাষ্ট্রসংঘের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন অ-সংক্রামক রোগ প্রতিরোধেও সাইকেলের ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রথম বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান হলেও কলকাতায় ইকোপার্কের একটি ছোট্ট অনুষ্ঠান ছাড়া প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও অনুষ্ঠানের উদ্যোগ দেখা যায়নি। শহরের কিছু সাইকেল ক্লাব নিজেদের উদ্যোগে দিনটি পালন করেছে। তারই অন্যতম 'কলকাতা সাইকেল সমাজ', এই ক্লাবের সদস্যরা ৩ জুন সকালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে গঙ্গার পাড় ঘুরে অ্যাকাডেমি চত্বর পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে। এদের দাবি সরকারী উদ্যোগে শহরের রাস্তায় সাইকেল লেন, প্রতিটি মেট্রো সেটশনের সামনে গ্যারেজ বা স্ট্যাণ্ড করে দেওয়া হোক যাতে অফিস যাত্রীরাও সাইকেলে যাতায়াত করতে পারেন। আমাদের দেশে বরাবরই সাইকেলকে নিম্নশ্রেণির যান হিসাবেই দেখা হয়। কিন্তু চীনের মতো বায়ুদূষণে জেরবার দেশগুলিতে সরকারী উদ্যোগেই সাইকেল ব্যবহারের পক্ষে প্রচার চালানো হয়। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান, নরওয়ে, জার্মানি, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড ও মার্কিন মুলুকে সাইকেল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এমনকি এইসব দেশের অনেক মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানরাও সাইকেল চালান। ঐ দেশগুলোর প্রতিটি শহরেই সাইকেল বান্ধব রাস্তা তৈরী হয়েছে। আমাদের আশা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে পৃথিবীর অন্যান্য শহরগুলোর মত কলকাতাও একদিন সাইকেলবান্ধব রাস্তা উপহার পাবে।

তথ্যসূত্র ঃ https://www. ndtv. com>offbeat, আনন্দ বাজার পত্রিকা ৩ জুন ২০১৮

সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান সাময়িকী

কালধ্বনি

যোগাযোগ 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা

ইমেল : kalodhvani@yahoo.co.in, M : 9830227186

সৌর সেচ সমবায়

গুজরাতের আনন্দ জেলার ধুন্দি গ্রামে ভারতের প্রথম সৌর সেচ সমবায় (Solar irrigation cooperative) তৈরী হয়েছে.। কারুর কারুর মতে এটা সমগ্র পৃথিবীতেই সৌর সেচ সমবায় গঠনের প্রথম নজির। ২০১৬ সালের মে মাসে এই সমবায়টি গঠন করা হয়। সমবায়টির প্রাতিষ্ঠানিক নাম ধুন্দি উর্যা উৎপাদক সহকারী মণ্ডলী (Dhundi Saur Urija Utpadak Sahakari Mandali বা DSUUSM)। এই সমবায়টিকে Solar Pump Irrigators' Cooperative (SPICE) নামেও ডাকা হয় এবং এই নামেই সমবায়টি গুজরাত সরকারের সমবায় রেজিষ্টারের দ্বারা নথীভুক্ত। ছয় জন কৃষক মিলে SPICE তৈরী করেন। এঁদেরই অন্যতম রমন পারামার—বছর পঁয়তাল্লিশের এই কৃষক সমবায়ের প্রাণপুরুষ ও সমবায়টির সম্পাদক।

সৌর সেচ সমবায়টি কাজ করে কেমন ভাবে তা জানাটা জরুরী। সৌর পাম্প (Solar pumps) নতুন কিছু ব্যাপার নয়। চাষের কাজে ভূগর্ভস্থ জল তোলার কাজে সৌর পাম্পের ব্যবহার ভারতে বাড়ছে। যখন চাষের জন্য মাটির নীচের জল তোলার দরকার হয়, সৌর পাম্প তখন সেই কাজ করে। অন্য সময় উৎপাদিত সৌরশক্তি (Solar Power) স্থানীয় একটি বিদ্যুৎশক্তি বন্টন কোম্পানী, Madhya Gujarat Vig Company Ltd (MGVCL), চাষীদের থেকে কিনে নেয়। সমবায়ের কৃষক সদস্যদের জন্য কোম্পানীটি প্রতি ইউনিট সৌর বিদ্যুতের দাম (feed-in-tariff (FIT) of per kilowatt-hour (kWh) of solar power) ৪ টাকা ৬৩ পয়সা ধার্য্য করেছে। SPICE -এর এই অতিরিক্ত সৌর বিদ্যুৎ সরাসরি MGVCL -এর বন্টন ব্যাবস্থায় (on-grid) গিয়ে পড়ে। ২০১৬ সালের মে মাসের এই সময়ে ভারতে সৌর বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি যা দাম ছিল, ৪ টাকা ৬৩ পয়সা তার মধ্যে সর্বনিম্ন। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার (opon bidding) মাধ্যমে সৌর বিদুৎ বেচার ক্ষেত্রে এর থেকে কম দাম আর কোন বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থার থেকে পাওয়া যায় নি। SPICE কৃষির শস্যের মতই সৌর বিদ্যুৎকে লাভজনক শস্য (remunerative crop) হিসাবে দেখতে চেয়েছে। ধুন্দি SPICE-এর ছয় সদস্যের সৌর পাম্পের মোট ক্ষমতা (capacity) ৫৬.৪ potential kilowatt (kWp)। সাত একর বা সাড়ে সতের বিঘার মত (এক বিঘা ০.৪০০৫ একরের সমান ধরে) কৃষিজমিতে সমবায় সৌরশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছিল। ২০১৬-এর জানুয়ারী থেকে ২০১৭-এর মে অবধি সময়ে উৎপাদন হয়েছিল ৯৭,৫০০ kWh সৌরবিদ্যুৎ, গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৫,৪১৭ kWh-এর মত বিদ্যুৎ। এর থেকে ৪৫,৩৫০ kWh শক্তি ব্যয়িত হয় সেচের জন্য পাম্প চালিয়ে জল তোলার কাজে। গড়ে মাসে প্রায় ২,৫১৯ ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি। আর MGVCL-কে বেচা হয় প্রায় ৫৩% শতাংশ উৎপাদিত বিদ্যুৎ, অর্থাৎ মাসে গড়ে প্রায় ২,৮৯৭ ইউনিট বিদ্যুৎ। শুধু বিদ্যুৎ বেচেই সমবায়ের লাভ হয় ৩.৭১ লক্ষ টাকার মত।

এই সমবায়ের কাজে সহযোগিতা জুগিয়েছে ইন্টার ন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (IWMI) এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ, এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড ফুড সিকিউরিটি নামের দুটি সংস্থা। তারা চাষীদের সবুজ শক্তি ব্যবহারের জন্য ইউনিট প্রতি ১ টাকা ২৫ পয়সা হিসাবে ও ভূগর্ভস্থ জলের সংরক্ষণের জন্য ইউনিট প্রতি ১ টাকা ২৫ পয়সা বোনাস হিসাবে দিচ্ছেন। এই হিসাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে চাষীদের ইউনিট প্রতি প্রাপ্তি হচ্ছে ৭ টাকা ১৩ পয়সা।

SPICE অবশ্য সৌর পাম্পের জল সেচের কাজের জন্যও বিক্রি করে। SPICE -এর সদস্যদের বার্ষিক গড় আয় সৌর সেচের ফলে অনেকটাই বেড়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে, শস্য বিক্রি, সৌর পাম্প চালিত সেচের জলের বিক্রি, অতিরিক্ত সৌর বিদ্যুত MGVCL কে বিক্রি, ইত্যাদি তিনটি খাতে মোট আয় হয়েছিল ৬.৯৫ টাকা লাখ টাকা (household in come)। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এই তিনখাতে আয় বেড়ে হয়েছে ১০.১৬ লাখ টাকা—প্রায় ৪৬% -এর মত। এই আয়ের মধ্যে সৌর শক্তি বিক্রি খাতে আয়ের অংশ ৬৫%। ধুন্দির এই প্রকল্পের বহুবিধ সুবিধার কথা, যেমন, অধিক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলনের নিয়ন্ত্রণ, সরকারের কৃষকদের বিদ্যুৎ খাতে দেওয়া ভর্তুকির হ্রাস, কার্বন পদচিহ্ন (carbon foot print) কমানো, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি, বলা হলেও, সমালোচনার বহরটাও কম নয়। প্রকল্পের মতের বিরোধীরা বলছেন, এই ব্যবস্থা বেশী করে ভূগর্ভস্থ জলের উপর চাষে কৃষকদের উৎসাহিত

করছে। নিবিড় জল-নির্ভর চাষে (water inefficient crops) চাষীকে উৎসাহ জোগাচ্ছে। যে সব চাষে কম জল লাগে, অথচ যারা অর্থকরী, সেসব শস্য ফলাতে চাষীদের উৎসাহিত করছে না। বেশী FIT দিয়ে (বিদ্যুতের বাজার মূল্যের চেয়ে) রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়েছে, প্রভৃতি। তবুও ধুন্দির এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তথ্যসূত্র ঃ

1. 'Promoting solar power as a remunerative crop', Economic and Political Weekly, November 11, 2017.
2. 'Solar irrigation cooperatives ঃ creating the Frankenstein's Monster for India's Groundwater', Economic and Political Weekly, May 26, 2018.
3. 'Farmers in this Gujarat Village have formed the world's first solar irrigation cooperative', https:// www.thebetterindia.com, August 01, 2016.

হিমাচলে মেষপালকেরা ভেড়া চুরির ঘটনায় বিব্রত

মেষ পালন হিমাচলের প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের অন্যতম প্রধান জীবিকা। ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির পালন মূলত পশম, দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রীর উৎপাদন, এমনকি কিছুটা হলেও পশু মাংসের প্রয়োজনেও। এমনিতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে জলের চিরপরিচিত উৎসগুলির অনিশ্চয়তার কারণে ও সবুজ বনানীর হ্রাস পাওয়ার জন্য তাদের পশুর বিচরণ ক্ষেত্র ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে; শিশু, মহিলা ও অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গ্রামে ফেলে রেখে শীতে ও গ্রীষ্মে পুরুষদের বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে, নতুন বিচরণ ক্ষেত্র খোঁজার তাগিদে। সারাদিনের হেঁটে চলা পাহাড়ী পথে, পথের ধারে ধারে খানাখন্দে গজানো গাছপালা, তৃণে, পশুরা তাদের খাবার পায়। বহে চলা ঝোরার জলে পিপাসা মেটায়। রাত্রে তাদের থামতেই হয়। রাত-পাহারার জন্য সংগে রাখতে হয় পাহাড়ী কুকুর। অবশ্য এ রীতি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জল ও জঙ্গলের চেনা উৎসের অনিশ্চয়তা তাগিৎ অনেকটাই বাড়িয়েছে। এককথায় বিচরণ ক্ষেত্রগুলোর উপর এইসব প্রান্তিক মানুষদের যে ঐতিহ্যগতভাবে অধিকার তা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। জীবন ও জীবিকার স্বাভাবিক ছন্দ অনেকটাই বিঘ্নিত।

রাতের অন্ধকারে তাদের অস্থায়ী বিশ্রামস্থলে হানা দিচ্ছে তস্করের দল। এক একটা হামলায় ৩০ থেকে ৪০ টা পশু চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। একটা পশুর বাজার দর ১০,০০০ টাকার মত ধরলে প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার ক্ষতি করে দিচ্ছে হানাদারেরা। তারা আগ্নেয় অস্ত্র ও অন্যান্য হাতিয়ারে যথেষ্টই শক্তিধর। পাহারাদার কুকুরগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে সহজেই। রাতের অন্ধকারে চুপিসাড়ে কাজ সারলেও, ন্যূনতম বাধা পেলেও আঘাত হানতে পিছপা হচ্ছে না এই অসহায় মানুষগুলোর উপর। এই হানাদার বাহিনীর হামলার পিছনে শক্তিশালী চক্র কাজ করছে। হানাদারেরা বেশীর ভাগই ভাড়াটে গুণ্ডা।

পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে এসব ঘটনা ঘটছে সেখানে না আছে কাছাকাছি কোন থানা, না আছে সরকারী কোন পাহারার ব্যবস্থা; পশু সম্পদ খুইয়ে অসহায় মানুষগুলোকে আবার পরদিন হাঁটতে হচ্ছে কোন জনপদের সন্ধানে, সেখানে থানাদারের কাছে তারা খোয়ানো সম্পদের পুনরুদ্ধারের আর্জি জানাতে পারে, তাদের প্রতি ঘটা এই অন্যায়ের নালিশ করতে পারে। কিন্তু হামেশাই থানাদার এটা ওটা কারণ দেখিয়ে তাদের নালিশ নিচ্ছে না। যার ফলে এই মেষপালকেরা তাদের ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি চরানোর কাজে যথেষ্টই ভয় পাচ্ছে। তার উপর রয়েছে আধুনিক তথাকথিত সভ্য জগতের রীতিনীতি না জানার ব্যাপারটা। পুলিশ তাদের অভিযোগ নথীকরণের জটিল প্রক্রিয়ায় আনতে চাইলে, স্বভাবতই অজ্ঞতার কারণে তাতে তারা সফল হচ্ছে না। ফলে তাদের প্রতি ঘটে চলা এই অন্যায় অবিচারের নিবৃত্তিতে প্রশাসনিক উদ্যোগও অবাস্তবায়িত থাকছে।

বিভিন্ন স্থানীয় মানুষজন ও সংস্থা তাদের এই দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল Shepherds Association of Himachal, HP Wool Federation প্রভৃতি। তাদেরই হস্তক্ষেপে ব্যাপারটায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কিছুটা হলেও শুরু হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The Statesman, 'Thieves take away goats, sheep in HP', 30. 03. 2018
2. 'Gaddies, Gaddinis and their goats; the migratory trail of hill people, by C.Noble; http://123 himachal.com/migration/gaddies.htm
3. 'Shepherds demand security', The Tribune, December, 2014; http:www.tribuneindia.com.

অনলাইন তথ্য ও খবরাখবর প্রচারে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস

প্রাইভেট স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল বা কেবিল টিভির মাধ্যমে প্রচারিত বা পুনঃপ্রচারিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কেবিল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক্স্ (CTN) রেগুলেশন আইন ১৯৯৫-এর আওতায় প্রোগ্রাম অ্যান্ড্ অ্যাড্ভার্টাইজমেন্ট কোড (Programmes and Advertisement Code)-এর ব্যবস্থা আছে, যার সাহায্যে এই বিষয় বা বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়— এমনটাই সরকারের ব্যক্তব্য। টিভি চ্যানেলগুলি CTN Act-এর Code মেনে চলতে বাধ্য, কোন ব্যতিক্রম হলে তা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা আছে এই আইনে, এমনটাই সরকারের ধারণা। স্বয়ংশাসিত সংস্থা প্রেস্ কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়ার (PCI) নিজস্ব নিয়ম আছে যার সাহায্যে প্রিন্ট মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

এসব দেখে বুঝে সরকারের মাথায় চেপেছে অনলাইন মিডিয়া ওয়েবসাইট, সংবাদ পোর্টাল, ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং, অনলাইন বস্তুসমূহ (online conents), প্রভৃতিকেও নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে হবে।

ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক (Ministry of Information and Broadcasting), ৪ এপ্রিল, ২০১৮-তে এক নির্দেশিকা জারি করে। এই নির্দেশিকা মতে একটা কমিটি গড়া হবে, যার কাজ হবে অনলাইন গণমাধ্যম (online media), সংবাদ পোর্টাল (news portals), অনলাইন বস্তুসমূহের (online contents), কাজকর্ম খতিয়ে দেখে নিয়মবিধি তৈরী করা যা দিয়ে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এদের কাজ কারবারকে আইনের আওতায় আনা যায়। দশ সদস্যের এই কমিটিতে থাকবেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সেক্রেটারীরা। এছাড়াও থাকবেন লিগ্যাল অ্যাফেয়ারস্ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ও প্রোমোশন বিভাগের (department) সেক্রেটারীরা। আর থাকবেন প্রেস্ কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়া, নিউজ ব্রডকাস্টার অ্যাসোসিয়েশন (News Broadcasters Association বা NBA) ও ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টার ফেডারেশন (Indian Broadcaster Federation বা IBF)-এর প্রতিনিধিরা। এছাড়া সরকারদ্বারা মনোনীত বিভাগ বা সংস্থার প্রতিনিধিরা বা সদস্যরা। পুরোপুরি সরকারী আমলা কেন্দ্রিক একটা কমিটি।

এর আগে জাল বা ভুয়ো খবর (fake news) নিয়ন্ত্রণের নামে সরকার কিছু রীতিনীতি (norms) ঘোষণা করে। তাতে বলা হয় এরকম ক্ষেত্রে সংবাদদাতার অ্যাক্রিডেশন (accrediation) প্রথমবার রীতিনীতি লঙ্ঘনের জন্য ছয় মাসের জন্য বাতিল (suspend) করা হবে। দ্বিতীয়বার নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এই বাতিল বলবৎ হবে একবছরের জন্য। তৃতীয়বার নিয়ম লঙ্ঘন করলে অ্যাক্রিডেশন চিরতরে (permanently) বাতিল করা হবে। দেশজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও প্রতিবাদ শুরু হয় এই ফতেয়াকে কেন্দ্র করে। তারপর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই রীতিনীতির লাগু করার নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়।

একথা মানতেই হয় যে ইন্টারনেট বা আর্ন্তজালের কল্যাণেই প্রান্তিক ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের প্রচার ও বিস্তারের সুযোগ অনেক বেড়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলে সম্ভব হয়েছে ছোট ছোট অনলাইন সংবাদ পোর্টালগুলোর নিরন্তর কর্ম তৎপরতা। এইসব পোর্টালগুলির রসদ বলতে রয়েছে নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ অলাভজনক কিছু কোম্পানী বা ট্রাস্ট। তারা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নয়। প্রান্তিক জনজীবন, শোষণে-নিষ্পেষণে-অত্যাচারে ভগ্ন মানবসমাজ, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট গোষ্ঠী, দলিত ভূমিপুত্র, প্রভৃতি যাদেরই খবরের দাম খবরের বেচা-কেনার হাটের মালিকদের কাছে কানাকড়িও নেই, রাজনৈতিক

দাদাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর, সরকারের কাছে তুচ্ছ, নগন্য ও মূল্যহীন, এদের কথাই এরা খবর করছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে খবরের দুনিয়ায় এইসব ছোট ছোট সংবাদ পোর্টালের প্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

এর একটা বড় তাৎপর্য রয়েছে। ভারতে কোন একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা কর্পোরেট হাউসের মালিকানায় অনেক গুলো করে গণমাধ্যম (mass media) রয়েছে। গণমাধ্যমগুলিকে কুক্ষিগত করে একক মালিকানার ছত্রছায়ায় আনার তীব্র আকাঙ্খা কর্পোরেট হাউসগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজেদের দলীয় স্বার্থে ও কর্পোরেট দুনিয়া তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে গণমাধ্যমগুলির কুক্ষিগত হয়ে একক বা কোন একটি গোষ্ঠীর মালিকানায় (cross media ownership) অন্তর্ভুক্তিকে সুরক্ষা দেয়। ভারতে ছোট ছোট অনেক ওয়েব-নির্ভর সংবাদ প্রকাশনা সংস্থা ও অনলাইন সংবাদ চ্যানেল রয়েছে যারা সরকার, প্রতিষ্ঠিত মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল বা কর্পোরেট দুনিয়ার বিপরীত মনোভাব পোষণ করে। মিডিয়ার মালিকানা ক্রমশ কতকগুলি মাত্র শক্তিধর মিডিয়া কর্পোরেট হাউসের অধীনে চলে যাওয়ায়, এইসব ছোট ছোট সংবাদ প্রকাশনা সংস্থা বা চ্যানেলের মিডিয়ায় প্রবেশাধিকার ভীষণভাবে সংকুচিত হচ্ছে। তার উপর সরকারের প্রস্তাবিত কমিটি যদি নিয়মের জালে তাদের পুরোপুরি বেঁধে ফেলার চেষ্টা করে, তবে তাতে সাধারণ মানুষেরই স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।

এমনিতে অবশ্য অনলাইন মিডিয়ার উপর খবরদারি যে একদমই নেই তা তো নয়ই; বরং মুদ্রণ ও দূরদর্শন ভিত্তিক খবরাখবর পরিবেশনার উপর যে নজরদারি রয়েছে, তার চেয়ে বেশীই রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি আইনের আওতায় অনলাইন মিডিয়ার উপর যথেষ্ট নজরদারির বন্দোবস্ত রয়েছে। বস্তুত অনেকক্ষেত্রেই এই নজরদারি চূড়ান্তভাবে বাকস্বাধীনতাকে লঙ্ঘনও করছে। এই অবস্থায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যাতে অবাধে ও নির্ভয়ে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা যায়, সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়া যায় দেশের সাধারণ মানুষের কাছে, সেই ব্যবস্থাই জোরদার হওয়া উচিত। তার বিপরীতে, অনলাইন ব্যবস্থা সঠিক ও নির্ভেজাল খবর পরিবেশনার যে সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে, বিধি চাপিয়ে তার কণ্ঠরোধ করলে, তা গণতান্ত্রিকতার মূলেই কুঠারাঘাতের সামিল হবে।

তবে এটা ঠিকই ভুল খবর, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত খবর, জাতি-হিংসা, ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক খবর, প্রভৃতি প্রচারের সম্ভাবনাও এ ব্যবস্থায় থেকে যায়। থেকে যায় অরুচিকর, কেবলমাত্র বাণিজ্যিক লাভের দিকে তাকিয়ে করা বিজ্ঞাপনের প্রচারের ও প্রসারের সম্ভাবনাও। আরও হরেকরকম ঝক্কি-ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনাও থেকে যায়। তারজন্য সংবাদের চরিত্র বিশেষে সংকেত লাগানোর ব্যবস্থা হোক। এরকম কন্‌টেন্ট্ কোডের (content code) সংস্থানও তথ্য-প্রযুক্তি অইনে আছে। তাতেও ভুল-ভ্রান্তি যে নেই তা নয়। তার সংশোধন দরকার। কিন্তু দু'একটা ক্ষতিকারক ব্যবস্থার দোহাই দিয়ে, যদি সম্ভাবনাময় গোটা ব্যবস্থার উপর নিয়মের বেড়ি পরানো হয়, তা মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য মোটেই উপযোগী হবে না।

এই সরকারী প্রয়াসের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হচ্ছে। জনগণ প্রেস কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়া, ভারতের নিউজ ব্রডকাস্টারস্ অ্যাশোসিয়েশন্, ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টারস্ ফেডারেশন, প্রভৃতি সকলের কাছে আশা করছে সকলে এগিয়ে এসে এই সরকারী প্রয়াসের বিপরীতে দাবি তুলবে যাতে একটা সুস্থ বিতর্কের পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেখানে অন-লাইন নিউজ মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণের মত এত জটিল একটা বিষয়ের উপর সদর্থক আলোচনা হতে পারে, আর তার ফলে তৈরী হতে পারে এমন কিছু বিধি-ব্যবস্থার যার মুখ্যভাগে থাকবে দেশের নাগরিক ও নাগরিক স্বার্থের দিকটা।

তথ্যসূত্র ঃ

1. 'I & B Ministry forms committee to regulate online media', https :// indiaexpress. com....., 5 April, 2018.
2. 'Modi Government turns its sights on freedom of digital media', https : // thewire.in.....6 April, 2018
3. 'Online media professionals oppose govt's proposal on content regulations for intrnet', https:/ /www. livemint. com....., 01 May, 2018
4. 'Regulation of online news,' letter by 'Network of Women in India', Mumbai; Economic and Pollitical Weekly, 14 April, 2018.

জৈব চাষের উপর কনভেনশন

গত ১৭ মার্চ ২০১৮, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Folk rice conservation and organic farming in Purulia District' নামের কনভেন্‌শন্‌টি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই সায়েন্স ক্লাবের সহযোগিতায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল সায়েন্টিফিক ওয়ার্কাস্ ফোরাম। কনভেনশনের উদ্দেশ্য ছিল রাসায়নিক চাষের (chemical farming) বিকল্প হিসাবে জৈব চাষের (organic farming) উপযোগী দিকগুলো তুলে ধরে জনমত প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন প্রয়াস চালানো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসডব্লুউএফের পক্ষে শ্রী রবীন ব্যানার্জী কনভেনশনের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিকল্প হিসাবে জৈব চাষের সম্ভাবনা আপাত রুক্ষ পুরুলিয়া জেলায় কি বিরাট ভাবে রয়েছে তাও তুলে ধরেন শ্রী ব্যানার্জী তাঁর বক্তৃতায়। তাঁর কথার সূত্র ধরে তিনি পুরুলিয়াতে তাঁর কাজের দিকটার খানিক উল্লেখ করেন। প্রান্তিক গ্রামগুলির মানুষজন স্থানীয় উপাদানে তৈরী সামগ্রী দিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে কিভাবে আর্থিক স্বনির্ভরতা পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোতে তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেন তিনি। সভার একদম শুরুতে বক্তৃতা করেন তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনের ফোনা ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট মহেশ রাজ সিঙ্ঘই। তেমনি পুরুলিয়া জেলার মহিলাদের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসাবে শ্রীমতী রুক্মিণী গড়াই তাঁর বক্তৃতায় বর্ণনা করেন এই গোষ্ঠী সদস্যদের লড়াই করে বেঁচে থাকার অদম্য মানসিকতার ও তাদের জীবন ও কার্যপ্রণালীর। সভায় আরও অনেক বক্তা ভাষণ দেন।

সেন্টার ফর্ ন্যাশনাল অর্গানিক ফার্মিং-এর ভূতপূর্ব অধিকর্তা, পরিতোষ ভট্টাচার্যের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Plant nutreant managemeat : Journey from tradition to modern technology'। দশহাজার বছরের কৃষি ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিনি দেখান এই চাষের ব্যাপারটা আসলে পুরোটাই জৈব চাষের ঘটনা। জৈব চাষের অবলম্বনে কোন পরিবেশ দূষণ হয় নি। কিন্তু শেষের ১৭৫ টা বছরের রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সব ওলট পালট করে দিল। মাটির উর্বরতা হ্রাস পেল, পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কেমিক্যাল লবি, এতটাই শক্তিধর যে জেনে বুঝেও মানুষ রাসায়নিক চাষেই নিষ্ঠ থাকলেন, বা থাকতে বাধ্য হলেন। কৃষকরা সর্বত্রই উপলব্ধি করলেন জমি আর আগের মত সাড়া দিচ্ছে না। কেমিক্যাল সারের বিপদ ও বায়োসারের অবাধ সম্ভাবনার কথা কৃষকদের তাই বুঝিয়ে বলাটা এতটাই জরুরী। জৈবসারের বাজারের অত্যন্ত সীমাবদ্ধতার প্রসংগে বক্তার মতামত হল সদর্থক ও সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

ডেভলপমেন্ট্ রিসার্চ কমিউনিকেশনের অর্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় কৃষির ক্ষেত্রে ইন্সটিটিউশ্যানালাইজড্ এডুকেশন বা জ্ঞান বয়ে বেড়ানোর শিক্ষার বিপরীতে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা-নির্ভর শিক্ষার উপরই জোর দেওয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। নেচার ফার্মিং, ইকোলজিকাল ফার্মিং ইত্যাদি সহ চাষের বিষয়ে আরও অনেক ধারণার অবতারণা করে বক্তা তাঁর বাস্তবের মাটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোয় তাদের ব্যাখ্যা করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ছাড়া, হাতে তৈরী স্লাইডের প্রদর্শনে সুনিপুন ভঙ্গিমায় কথা কওয়ার মাধ্যমে বক্তার বক্তৃতা শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

সি পি সি বি-র প্রাক্তন সিনিয়র সায়েন্টিস্ট দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় কথা বলেন কচুরীপানার দূষণ নিরোধকের (pollutant remover) ভূমিকা নিয়ে এবং সেই সংগে কচুরীপানা নিয়ে গ্রামের মানুষের সাথে তাঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসংগে। সিএসআইআরের আইআইসিবির বিজ্ঞানী তুষার চক্রবর্ত্তী বক্তব্য রাখেন ভারতের কৃষি সংকট ও জি এম শস্যের উপর। এগ্রিকালচারাল ফার্মিং সেন্টারের (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা) অনুপম পাল, ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভলপমেন্ট্ সেন্টার (পুরুলিয়া জেলা)-এর উপ-প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সুশান্ত পাত্র, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অসিত চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতিরাও সভায় বক্তৃতা করেন। বর্ধমান থেকে আসা রফিকুল ইসলাম তাঁর কৃষিকাজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে শহুরে মানুষদের উদাত্ত আহ্বান জানান তাঁর গ্রামে গিয়ে বসবাস করার জন্য ও জৈবচাষকে অবলম্বন করে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রাকে বেছে নেওয়ার জন্য। অভিরামপুরের অভ্র চক্রবর্ত্তীও তাঁর নিজস্ব ফার্মল্যান্ডে জৈব চাষের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে এই চাষের বিভিন্ন সদর্থক দিকগুলি তুলে ধরেন। সভার শেষে পুরুলিয়ার স্বনির্ভরগোষ্ঠীর জৈব চাষের বিভিন্ন কৃষিজাত প্রোডাক্টস্ ও হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। যাদবপুরের ছাত্রদের তৈরী মোবাইল ফোন নির্ভর একটি মার্কেটিং অ্যাপেরও উদ্বোধন করা হয় সভায়। এই অ্যাপ সম্ভাব্য ক্রেতা ও চাষীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে জৈব চাষের বাজারকে চাঙ্গা করবে বলে, উদ্ভাবকদের পক্ষ থেকে বলা হয়।

শিক্ষার খোলামেলা আলোচনা

দীক্ষা এডুকেশন ট্রাস্ট ইন্দুমতী সভাগৃহে (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) গত ১১ মে ২০১৮ শিক্ষার উপর একটি আলোচনার উদ্যোগ নেয়। তার পোশাকি নাম 'শিক্ষক-ছাত্র চাওয়া পাওয়া ঃ একটি খেলামেলা আলোচনা', কার্যত শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর খোলামেলা কথাবলা। শিক্ষক-ছাত্রের চাওয়া পাওয়ার বিষয়ের উপরই কেবলমাত্র আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকেনি। এখানে বলে রাখা দরকার, দীক্ষা এডুকেশন ট্রাস্ট, ডিহি গঙ্গাজোয়ারায় (ডিহি গঙ্গাজোয়ারা, সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০) সক্ষম ও বিশেষভাবে সক্ষম শিশু ও কচি কাঁচাদের নিয়ে একটা স্কুল চালায়। তিন থেকে বারো বছর বয়েসের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন শিক্ষা শ্রেণীতে (নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত) ভাগ করে সঠিকমানের (quality) শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে। শিক্ষার সাথে আছে ছবি আঁকা, গান, নাট্যশিক্ষা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, হাতের কাজের শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়েও প্রশিক্ষণ। শিক্ষা দেওয়ার পুরো পদ্ধতিটার মধ্যেই 'করে দেখা ও শেখা'র উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শিক্ষা দেওয়ার পুরো পদ্ধতিটাই শিশু-শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের কাছে ভীষণ আনন্দের। এছাড়াও রয়েছে খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও গোষ্ঠীভিত্তিক কাজকর্মের ব্যবস্থা। এই সমগ্র শিক্ষা-প্রচেষ্টার অভিমুখে রয়েছে পিছিয়ে-পড়া সমাজের মূলত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা। তাদের মধ্যে সক্ষম ও বিশেষভাবে সক্ষম এই দু'ধরনের বাচ্চারাই রয়েছে। তাদের শুধু শিক্ষার ব্যবস্থাই দীক্ষা এডুকেশন ট্রাস্ট করছে না, সুষম খাদ্য প্রদান করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যাতে ঠিক ঠিক হয়, তার দিকেও তীক্ষ্ণ নজর দিচ্ছে। দীক্ষা ট্রাস্টের সদস্যরা তো রয়েছেনই, বাইরের দিদিমণিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে।

ঐদিনের এই খোলামেলা আলাপচারিতায় অনেক অধ্যাপক-শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, সুজয় বসু, সলিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেব বাগচি, নমিতা চৌধুরী, মিহির চক্রবর্ত্তী, রবীন চক্রবর্ত্তী প্রমুখেরা। এঁরা সকলেই স্বনামধন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। অনুষ্ঠানের শুরুতে এঁদেরই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৩৫ বছর আগে একটি কলোনির স্কুলের এক ছাত্র স্মৃতি রোমন্থন করেন। তিনি চোখের জলের ধারায় স্মৃতির গভীর থেকে তুলে সাজিয়ে ধরেন সেদিনের কত কথা। সেই স্কুলে একটি গান রোজ গাওয়া হত। সেই গান তিনি যত্ন করে তাঁর দুই মেয়েকে শিখিয়েছেন। তাঁর দুই কন্যা সেই গান শোনালেন। আলোচনার চলাকালীন দীপাঞ্জনবাবু অসুস্থ শরীরে সভায় উপস্থিত হন। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন ছাত্রদের প্রশ্ন করতে শেখাতে হবে। শুধু পড়ার বিষয়ের ক্ষেত্রেই নয়, তারা প্রশ্ন করবে সব কিছু নিয়েই। এই প্রশ্ন করার তীব্র স্পৃহা যদি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা না যায়, তাহলে শিক্ষার সব আয়োজনটাই বিফল হতে বাধ্য। শিক্ষকদেরই এ দায়িত্ব নিতে হবে। সক্রেটিস থেকে পৃথিবীর সব মহান শিক্ষকই এই দায়িত্ব নিয়েছেন। ছাত্রদের প্রশ্ন করতে শেখানোর অভিযোগেই সক্রেটিসকে অভিযুক্ত করা হয়, যার পরিণতিতে বিষপানে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। ছাত্র-শিক্ষকদের বর্তমানের দুঃখজনক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সুজয়বাবু বলেন তাঁদের আমলে তাঁরা ছাত্রদের শাস্তি দিতেন। কিন্তু সমগ্র পদ্ধতিটার মধ্যে একটা শিক্ষকসুলভ স্নেহ, মমতা, ছাত্রদের ভালবাসার স্পর্শ থাকত। যার ফলে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কটা বর্তমানের মত এমন খারাপ হয়ে যায় নি। বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার ব্যাপারটা তার মধ্যে ছিল। শুভেন্দু দাশগুপ্ত বলেন যে শিক্ষক ছাত্র সবাইকে একই মঞ্চে থাকতে হবে এবং একই সাথে কাজ করতে হবে। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। রবীন চক্রবর্তা তাঁর সময়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া ও শেখার বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলেন। সভায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই কম ছিল। তাই তাদের সাথে শিক্ষকদের মত বিনিময়ের কোন আয়োজন করা যায়নি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শ্রী অনুপম বসু। আর তাঁকে এ কাজে যারা সাহায্য করেন তাদের মধ্যে দেবাশীস সরকার ও পবন মুখোপাধ্যায় অন্যতম।

মাটি দিয়ে বাড়ী তৈরীর কলাকৌশলের কর্মশালা

'মানসে'র ('মানস', তেঘড়ি, মদনপুর, নদীয়া) উদ্যোগে সংস্থার সভাঘরে, ২রা ও ৩রা জুন, ২০১৮ দু'দিনের এক অভিনব কর্মশালার আয়োজন হয়। স্থানীয় সামগ্রী দিয়ে চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বনে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে কম খরচে বাড়ী-তৈরীর কলাকৌশলের উপর এই কর্মশালা। পোশাকি নাম 'স্টেবিলাইজড্ মাড্ ব্লক, স্টেবিলাইজড্ র‍্যামড্ আর্থ, স্টেবিলাইজড্ অ্যাডোব অ্যান্ড মাড্ কংক্রিট ইউজিং কনস্ট্রাক্শন্ (সি) অ্যাণ্ড ডিমলিশ্ন্ (ডি) ওয়েস্ট'। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ব্যাঙ্গালুরুর সংস্থা 'মৃন্ময়ী'র (Mrinmoyee) আর্কিটেক শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু। 'মানস'-এর বন্ধু, রোগী তাদের পরিবার, সহযোগী, সাথী, সমাজকর্মী, ছাত্র প্রভৃতি অনেকে এই কর্মশালায় যোগদান করেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক আলোচনা করেন শ্রী বসু। কর্মশালার শুরুতে মানসের সম্পাদক ডঃ জ্যোর্তিময় মজুমদার কর্মশালার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন। তারপর শুরু হয় কর্মশালার লেখাপড়া ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের কাজকর্ম। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শ্রী বসু সহজ বাংলায় বুঝিয়ে বলেন বিভিন্ন বিষয়গুলি। 'কেন আমরা মাটির বাড়ি তৈরী করব' (Why build with mad)-এ জাতীয় প্রশ্ন দিয়ে আলোচনার শুরু হয়। ধীরে ধীরে অবতারণা করেন পরের বিষয়গুলো, যেমন, মাটি কি, কি করে তাকে পরীক্ষা করতে হয়, সেই পরীক্ষার ফল থেকে কিভাবে বুঝতে হয় তা দিয়ে বাড়ি করা যাবে কিনা, যদি না যায় তাহলে কি করতে হয়, যাতে মাটিকে বাড়ি তৈরীর উপযোগী করে তোলা যায়, প্রভৃতি। এরপর আসে স্টেবিলাইজড্ মাড্ ব্লকের (Stabilized mud block বা SMB) প্রসংগ। এসএমবি-এর মাটি কিভাবে বানাতে হয় তার কথা। বর্জ্য পদার্থ কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার আলোচনা। স্টেবিলাইজার কি ও তার ব্যবহার কেন প্রয়োজনীয় তার ব্যাখ্যা। এ পর্যায়ের সবশেষে আসে এসএমবি তৈরীর কৌশলের কথাবার্তা ও এজন্য দরকারী যন্ত্রপাতির আলোচনা। বিস্তৃত আলোচনা হয় এসব বিষয় ঘিরে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অজানা অনেক কিছুই জানতে পারেন। এমনি করেই আলোচিত হয় র‍্যামড্ আর্থের কৌশলের বিষয়েও। এই প্রযুক্তি বর্তমানে কেন দরকারী, কেন সাশ্রয়ী, কেন পরিবেশ বান্ধব, কেন পরম্পরাগত ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির সাথে ভীষণভাবে মানানসই তাও কর্মশালার পরিচালক শ্রী বসু বুঝিয়ে বলেন। প্রসংগক্রমে কর্ণাটক ও ভারতের অন্যত্র এই সাশ্রয়ী, পরিবেশ-বান্ধব, সবুজ প্রযুক্তি বাড়ী তৈরীর প্রয়োগিক ক্ষেত্রে কি ভীষণভাবে সফল হচ্ছে, তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। কর্মশালায় স্টেবিলাইজড্ মাড্ ব্লক ও র‍্যামড্ আর্থ ব্লক তৈরীর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাধারণ কিন্তু সুষম খাবারদাবার, আন্তরিক ঘরোয়া পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের ভাললাগার উষ্ণতায় কর্মশালাটি খুবই সার্থক হয়েছিল।

আমাদের জানা অজানা যে মানুষেরা
মানবকল্যাণে সমাজকল্যাণে পরিবেশকল্যাণে
নীরবে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জানাই আমাদের শ্রদ্ধা

চিঠিপত্র

আরও একটু সৌজন্য আশা করেছিলাম

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার গত বছরের বার্ষিক সংখ্যায় (জানুয়ারী—ডিসেম্বর ২০১৭) আমি একটি লেখা লিখি। লেখাটির নাম ছিল 'ছি ছি এসব নিয়ে কেউ লেখে নাকি?' বিষয় গৃহ পরিচারক-পরিচারিকা, অর্থাৎ বাড়ীতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের অধিকার। বি. ও. বি. লেখাটি প্রকাশ করে বটে, কিন্তু একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় নোট সহযোগে, যেখানে আমার লেখার বেশ কিছু তথ্যগত ভুল তুলে ধরা হয়। সে প্রসংগে আসব কিন্তু তার আগে দু-একটি অন্য কথা একটু বলে নিতে চাই।

আমি নিতান্তই এলেবলে কলমচি তাতে কোনও সন্দেহই নেই, তবুও দেখতে দেখতে লেখালিখির বসয় কুড়ি পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে নানান ছোট বড় পত্রিকায় লেখার সুযোগ হয়েছে বটে কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। লেখায় ভুল থাকতেই পারে, লেখক সর্বজ্ঞ নয়, প্রশ্নটি হল সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়াটা আমি মনে করি, সম্পাদকের মূল কাজগুলির একটি। প্রশ্ন আসে যদি লেখক তাঁর ত্রুটি সংশোধন করতে না চান বা সেই সম্বন্ধে বিরোধী মত পোষণ করেন (সেটাও হতেই পারে)। তবেই, সম্পাদকীয় নোট দেওয়ার কথা ওঠে। এবং সেই নোটও কিন্তু তথ্যগত ভুলের ক্ষেত্রে সাধারণত হওয়ার সুযোগ থাকে না (কেননা তথ্য তথ্যই তার আবার পক্ষে বিপেক্ষে কি)। সেটা ঘটতে পারে মূলত মতামতের ক্ষেত্রে। এবং সেটারও সুযোগ কম, কেননা অধিকাংশ পত্রিকাই প্রথমেই বলে রাখে যে লেখার মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব, পত্রিকার তাতে কোনও দায় নেই। (বি. ও. বি.-ও লিখেছে সেটা) এই পরিপ্রেক্ষিতে বি. ও. বি.-র এই নোট খুবই বিস্ময়ের যে তাতে সন্দেহ নেই।

আরও বিস্ময়কর হল যে এই সংখ্যার অতিথি সম্পাদক শ্রী সৌমেন গুহর সংগে টেলিফোনে পত্রিকা প্রকাশের আগে (এই লেখাটি নিয়ে) আমার প্রায় একঘন্টা কথা হয়। উনি কিন্তু তখন একবারের জন্যও এই সব তথ্যগত ত্রুটির কথা কিছু বলেন নি। হাঁ, উনি বলেছিলেন যে উনি আমার বক্তব্যের সংগে অনেক জায়গাতেই একমত নন, কেননা উনি বহু উদাহরণ জানেন যেখানে বাড়ীর কাজের লোককে বাড়ীর লোকেরই মর্যাদা দেওয়া হয়, ঐসব ছ্যাঁকা দেওয়া টেওয়ার উদাহরণ সেক্ষেত্রে একেবারেই চলে না। আমি ওনার সংগে একমত হতে পারিনি, কেননা আমি তখনও মনে করতাম, এখনও মনে করি যে, ঐ সব সদর্থক ঘটনাগুলি ব্যতিক্রম এবং সেটাকে ব্যতিক্রম হিসাবেই দেখা দরকার। সাধারণভাবে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের চোখ, তার মূল্যবোধ বাড়ীর কাজের লোককে, কাজের লোক ভাবতেই অভ্যস্ত তার বাইরে কিছু নয়। ব্যতিক্রম কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। দু-একটা সেরকম উদাহরণ আমিও কি জানিনা? কিন্তু সংখ্যায় পাল্লা ভারী উল্টোদিকেই। কিন্তু তবুও আমি বলেছিলাম যে সেইসব পজিটিভ উদাহরণগুলোকে উনি লেখার মধ্যে জুড়ে দিতেই পারেন, তাতে লেখাটিরও একটা অন্য ডাইমেনশন আসবে। পরে দেখলাম সে কাজ করা হয়নি। কেন, তার উত্তর সম্পাদক মশাই ও সম্পাদকমণ্ডলী ভালো দিতে পারবেন। খুব ভালো হয় পরে কোনও সংখ্যায় সৌমেনদা যদি এটা নিয়ে লেখেন।

এই কথাগুলোর উল্লেখ করা মানে কিন্তু সৌমেনদাকে কোনও অর্থেই ছোট করা নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে চিনতাম না, এর আগে কোনও দিন কথাও হয়নি ওনার সংগে কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও নামে ওনাকে দীর্ঘদিন ধরেই জানি। বিশেষ করে মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে, অর্চনা গুহ মামলায়, ওনার দীর্ঘ, ইতিহাস সৃষ্টিকারী লড়াই যে কোন গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ চিরকালই শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবেন। আমিও করি। কিন্তু তার সংগে এটাও বলি যে এই ক্ষেত্রে ওনার ধারণার সংগে ও সম্পাদনার এই পদ্ধতির সংগে দ্বিমত পোষণ করছি। এর থেকে আর একটু বেশী সৌজন্য ও ভদ্রতা আমি সৌমেনদা ও বি. ও. বি.-র বন্ধুদের থেকে আশা করেছিলাম।

এবার আসি তথ্যর প্রসংগে। প্রথমেই বলি The minimum wages Act -র প্রণয়নের বছর 1872 নয়, 1948 ই হবে। এটা ভুল এবং আমারই ভুল। ভুলের কোনও অজুহাত হয় না। তবুও বলছি সালের এই তফাতে লেখাটির মূল বক্তব্যের কিন্তু কোনও হেরফের হয়না। তবুও আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল, এবং আমি সেই কারণে ক্ষমাপ্রার্থী। ধরিয়ে দিলে তখনই ঠিক করে দিতাম তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

আমার লেখার দ্বিতীয় যে ভুলটির প্রতি সম্পাদকমণ্ডলী দৃষ্টি আনয়ন করেছেন অর্থাৎ রাজস্থানে গৃহ পরিচালকদের মাসিক বেতন 5600 টাকা, তার কিন্তু যথেষ্ট তথ্যগত ভিত্তি আছে। যে কেউ গুগুল সার্চ করলেই দেখবেন যে 2015 সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বেরোন খবরটি (India Today, Times of India, DNA India ইত্যাদি পত্রিকায়) যে রাজস্থান সরকার মাসিক 5642 টাকার ন্যূনতম বেতন স্থির করেছেন বাড়ীর পরিচারকদের জন্য আট ঘন্টার কাজের জন্য।

কিন্তু কথা সেগুলো নয়। কথা হল তথ্যের উল্লেখ কেন? যে কথাটা বা যে প্রশ্নটা আমি লেখায় তুলতে চাইছি তা যাতে আরও জোরদার হয় তার জন্যই তথ্যের প্রয়োজন নয় কি? এখন দেখতে হবে আমি যা বলছি এবং তার সমর্থনে যে তথ্য দিচ্ছি, সম্পাদকমণ্ডলীর দেওয়া তথ্য কি সেই ধারণাকে সমর্থন করছে না বিরোধীতা করছে। আমার তো মনে হয় দুটো ক্ষেত্রেই সম্পাদকমণ্ডলীর দেওয়া তথ্য আমার লেখার বক্তব্যকে খণ্ডন তো করেই না, বরং জোরালোই করে। ওনারা বলছেন মাসিক বেতন 5600 টাকা নয়, 2500 টাকারও কম—তাহলে কি তা এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি সিস্টেমের শোষণকেই আরও একটু বেশী করে তুলে ধরে না? সেইটুকু ভুল, যদি আদৌ কিছু ভুল হয়ে থাকে তাকে কি সংশোধন করে নেওয়া যেতো না? ধরিয়ে দিলে? মাফ করবেন, যাঁরা তথ্যের বিশুদ্ধতা মানে দশমিকের পরেও কটা শূণ্য আছে তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেন, আমি তাঁদের দলে পড়ি না, ভবিষ্যতে পড়তে চাইও না।

আসলে মূল সমস্যাটা বোধহয় অন্য জায়গায়। বি. ও. বি.-তে লেখাটা যে জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম যে এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মানুষেরাও তাঁদের বাড়ীর, তাঁদের আত্মীয়ের বাড়ী কাজ করা 'লোকজনদের' অধিকারের কথাটা মানতে চাননা, অস্বস্তিতে পড়েন, বি. ও. বি.-র এই নোটও সেই কথাটাকেই কোথাও যেন সমর্থন করছে। সত্যিই তো এসব নিয়ে কেউ লেখে নাকি? কিন্তু একটা কথা জানলে বোধহয় তাঁরা একটু শ্লাঘা বোধ করবেন যে এমনকি আমি নিজেকেও এই সমালোচনাটার বাইরে রাখছি না। এই লেখা পড়তে পড়তে যাঁদের চোখ সরু হয়, কপাল কুঁচকে যায়, বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে, আমি নিজেও তাঁদেরই দলের লোক। এক অর্থে এই কথাগুলো আত্মসমালোচনা। নিজেকেও শোনানো।

অনিন্দ্য রুদ্র
২২ / ০৬ / ২০১৮

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৮৯
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা
মুদ্রকের নাম, জাতি, ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বা : রবীন মজুমদার
প্রকাশক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বি ও বি ও-শতকে

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পড়ুন ও পড়ান

পুরোনো বি ও বি

সংগ্রহ করুন

Vigyan O Vigyankarmi
Reg. No. 34929/79

Rs. 50.00

Vol. XLI No. 1-2
January 2018 - June 2018

প্রয়াত বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের একটি পরিচিত ও ছবি উইকিপিডিয়ায় নিচের দুটি URL-এ পাওয়া যাবে –

পরিচিতি : **Draft : Bishuddhananda Purokait**

http://speedydeletion.wikia.com/wiki/Draft:Bishuddhananda_Purokait

ছবি : File **: Bishuddhananda Purokait.Jpg**

https://commons. wikimedia.org/wiki/ File: Bishuddhananda_Purokait.Jpg

বিজ্ঞান, সমাজ ও মানুষ : সৌমেন গুহ'র নির্বাচিত রচনার একটি সংকলন ই-বুক হিসেবে পড়া যাবে –

https ://sites.google.com/site/saumenguha1/

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : স্মরণ বিস্মরণ ও নির্মাণ—রবীন মজুমদার (১৩বি চর্চাপদ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ ফোন : ২২৫৭-৩১৪৪)

শিবপ্রসাদ নিয়োগী'র একটি ইতিহাস সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বই ও অন্য দুটি কবিতার বই :

১. **আলো-আঁধারির উত্তরাধিকার : বাঙলার নবজাগরণ** (কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২),

২. **পিছুডাক** (নানামুখ, নিলয় রায়, ১/১ কেদারনাথ ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা-৭০০০৩৬),

৩. **নিমযুগ** (কালধ্বনি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ২/১এ আশুতোষ শীল লেন। কলকাতা-৭০০০০৯)

অভিজিৎ লাহিড়ী'র একটি ওয়েবসাইট, যেখানে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত "**Basic Physics: A Comprehensive Survey**", "**Science as an Interpretation of the World : Inference and Belief**" ও আরও কয়েকটি বই-এর পরিচিতি এবং পদার্থবিদ্যার উপর নানা আলোচনা পাওয়া যাবে – http:/physicsandmore.net

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী'র একটি গানের অনুবাদের ও আর একটি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিজ্ঞান-ধর্মের স্পর্শতল, মার্কসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত বই :

1. **HUNDRED SONGS OF RABINDRANATH TAGORE**- ***Inner journey through the original songs by way of translation*** (প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা- ৭০০০০৪)

2. **THE FORGOTTEN MESSAGES FROM THE PIONEERS OF 'SCIENCE'**

VS.

INSTITUTIONAL 'SCIENCE'-EDUCATION & 'SCIENTIFIC' SOCIAL ACTIVISM

(রূপালী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬ ফোন: ৯৪৩২০৬২৯২৮ / ৮৪৭৯৯১২৩৬২)

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী'র নির্বাচিত বাংলা ও ইংরেজী রচনা/অনুবাদ (গদ্য ও পদ্য)/ছড়া সম্বলিত (বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিজ্ঞান-ধর্মের স্পর্শতল, মানবিক অধিকার, আন্দামানের জারোয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত) একটি ই-বুক ও একটি ওয়েবসাইট

Writings of Subhas Chandra Ganguly : An Open Access E-book

http:// sites. google.com/site/subhascganguly/writings

RANDOM THOUGHTS https://sites.google.com/site/writingsofsganguly/

অনুপ্রেরণাদায়ী উদ্যোগ ও পড়বার পত্রিকা :

আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, তেঘরি, বাঁকুড়া

শ্রমজীবী হাসপাতাল, বেলুড় (বালি), শ্রীরামপুর (বড় বেলু)

সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, এফ. এস. হাট, সরবেড়িয়া: মুখপত্র– লোকগাথা

মন্থন সাময়িকী, বি/২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা- ১৮, ফোন: ২৪৯১-৩৬৬৬

প্রয়াত কবি সমর সেন প্রতিষ্ঠিত-সম্পাদিত ও বর্তমানে তিমির বসু সম্পাদিত, গত ৫০ বছর ধরে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক **Frontier** -এর (৬১ মট লেন, কলকাতা- ৭০০০১৩, ফোন: ২২৬৫-৯২০২)

ওয়েবসাইট: http://frontierweekly.com

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে রচয়িতা, 10 কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-700 001 থেকে মুদ্রিত।